দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

'অপারেশন সিঁদুর'
পহেলগাঁও হামলার যোগ্য
জবাব ভারতের — পৃঃ ১৬

জাতগণনা সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে
মজবুত করে সামাজিক ন্যায়ের
পথ প্রশস্ত করবে— পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ১৯ মে, ২০২৫।। ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৯ মে - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

জঙ্গি সংগঠনের মতো কিছু রাজনৈতিক দলকেও নিষিদ্ধ করা উচিত : এরপরেও বলতে হবে দেশের শত্রু কারা?
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ভারত কেন থেমে গেল? মোদী কি ভয় পেলেন?
◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

এক মন্ত্রে সঞ্চারিত তন্ত্র ◻ মধুভাই কুলকর্ণী ◻ ৮

জাতগণনা সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে মজবুত করে সামাজিক ন্যায়ের পথ প্রশস্ত করবে ◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ১১

কাশ্মীরে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ : 'সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না?' ◻ দেবজিৎ সরকার ◻ ১৩

মোদী-বেগিন যেন এক ছাঁচে গড়া রাষ্ট্রনেতা
◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১৬

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং ভারতের যোগ্য জবাব
◻ অজয় ভট্টাচার্য ◻ ১৮

গরমে ত্বকের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে বেশি করে জল পান করুন
◻ ডাঃ ইমরান ওয়ালি ◻ ১৯

গরমকালে শরীর সুস্থ রাখার উপায় ◻ পঙ্কজ বিশ্বাস ◻ ২১

গরমকালে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, জল ও ছাতা সঙ্গে রাখুন
◻ ডাঃ সুশান্ত মিত্র ◻ ২৩

গরমে শরীরকে রক্ষা করতে প্রকৃতির সাহায্য নিতে হবে
◻ ডাঃ দেবাশিস পাহাড়ি ◻ ২৪

ভারতীয় নারীশক্তির প্রতীক সিঁদুর ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

ব্রজধামের শ্রীশ্রী যোগমায়া কাত্যায়নী দেবী
◻ অর্ণব দাস ◻ ৩৩

স্বাধীনতা যুদ্ধের এক অগ্নিকন্যা : বীণা দাস
◻ প্রবীর আচার্য্য ◻ ৩৪

অপারেশন সিঁদুর : পহেলগাঁও হামলার যোগ্য জবাব ভারতের
◻ কর্ণেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য ◻ ৩৫

গরমকালে নাক, কান ও গলার সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, অবহেলা করবেন না
◻ ডাঃ পীযূষকান্তি মান্না ◻ ৩৯

জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে পাকিস্তানের ওপর ভারতের সামরিক প্রত্যাঘাত : বিশ্বরাজনীতির উপর এর প্রভাব
◻ বিমলশঙ্কর নন্দ ◻ ৪৩

একটি মেয়ের কুড়িটি চিঠি—মৃত্যুপুরীর সঞ্জীবনী
◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৪৬

যুদ্ধের মুহূর্তে কেন আইএমএফ পাকিস্তানকে বাঁচাতে এল?
◻ কৌটিল্য ◻ ৪৮

ধর্ম হিংসা তথৈব চ : রাষ্ট্ররক্ষার মন্ত্র ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৬ মে ২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২৬ মে ২০২৫

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

স্বাধীনতাযুদ্ধের অগ্রণী সেনানী। মাতৃভূমির প্রতি সমর্পিত জীবন। অপূর্ব সংগঠন কুশলতা। ছদ্মবেশ ধারণে কিংবদন্তী। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গঠন করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে। তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতের প্রত্যাঘাত

কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সংঘটিত হইল নৃশংস সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে তাহাদের ধর্ম যাচাই করিয়া হত্যা করিল ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা। অতীতে বহুবার পাকিস্তানি মদতপুষ্ট ইসলামি সন্ত্রাসবাদের শিকার হইয়াছে ভারত। নিরীহ নাগরিকদিগের রক্তে সিক্ত হইয়াছে ভারতের মৃত্তিকা। ১৯৪৭ সালের পর হইতে অদ্যাবধি প্রায় ২ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ও নাগরিক পাকিস্তান ও তাহাদের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নিহত হইয়াছে। বহুবার পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণের সাক্ষী রহিয়াছে সমগ্র বিশ্ব। জন্মমুহূর্ত হইতেই পাকিস্তানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল— 'জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ', অর্থাৎ আল্লা নির্দিষ্ট পথে অনবরত জেহাদ। বলা বাহুল্য যে, এই জেহাদ তাহার প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধ শেষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দ্বারা যুদ্ধবন্দি হয়। জন্মগ্রহণ করে স্বাধীন বাংলাদেশ। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় ঘটিবার কারণে সেনা নিয়ন্ত্রিত পাক প্রশাসন উপলব্ধি করে যে সম্মুখ সমরে ভারতকে পরাজিত করিবার বিষয়টি তাহাদের দিবাস্বপ্ন মাত্র। এই কারণে তাহারা ভারতের সহিত ছায়াযুদ্ধে লিপ্ত হইবার পরিকল্পনা করে। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে গড়িয়া উঠিতে থাকে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং তাহার অন্তরালে পরিচালিত হইতে থাকে জেহাদি জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির। পাকিস্তান জুড়িয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে সশস্ত্র জঙ্গি বাহিনী। এই সন্ত্রাসবাদীরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ইন্ধনে আফগানিস্তান হইতে সোভিয়েত সেনা অপসারণ করিতে প্রয়াসী হয়। সেই যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ভারতের জম্মু-কাশ্মীরে তাহারা ক্রমাগত অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। ১৯৮৯ সাল হইতে কাশ্মীর উপত্যকা জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়ে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ। প্রকাশ্যে আসে লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিন, হরকত-উল-মুজাহিদিন, আল-বদর, জেকেএলএফ প্রভৃতি জঙ্গি সংগঠন। ১৯৯০ সালে ভয়াবহ গণহত্যার মাধ্যমে সমগ্র উপত্যকাকে হিন্দু শূন্য করা হয়। সেই সময় হইতে সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর জুড়িয়া চলিয়াছে জঙ্গি উপদ্রব, সন্ত্রাসবাদী হানাদারি, অনবরত সংঘর্ষ।

১৯৯৩ সালে মুম্বই বিস্ফোরণ, ১৯৯৯ সালে আইসি-৮১৪ বিমান অপহরণ, ২০০১ সালে ভারতীয় সংসদ ভবনে আক্রমণ, ২০০৮ সালে মুম্বই হামলা— আঘাতে আঘাতে ভারতকে জর্জরিত ও রক্তাক্ত করিবার প্রকল্পে যুক্ত থাকিয়াছে পাকিস্তান। অতীতের ভারত সরকার সেই সকল আক্রমণের প্রত্যুত্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকিয়াছে। ২০১৪ পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে এক বৃহৎ পট পরিবর্তন। উদয় হইয়াছে এক নূতন ভারত। সন্ত্রাসবাদ সহনশীলতার বিপ্রতীপে এই ভারত সংকল্পগ্রহণ করিয়াছে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলীকরণের। ২০১৬ সালে উরি ও ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় পাক সন্ত্রাসবাদী হামলার যোগ্য জবাব দিয়াছে ভারতীয় সেনা। সার্জিকাল স্ট্রাইক ও বিমান হানার মাধ্যমে শত্রুশিবিরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে সন্ত্রাসবাদ ধ্বংসের বার্তা। জম্মু-কাশ্মীরে প্রযুক্ত ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বিলোপের মাধ্যমে উপত্যকা জুড়িয়া ইসলামি সন্ত্রাসবাদে লাগাম পরাইতে সক্ষম হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমতাবস্থায় গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীর উপত্যকার বুকে সংঘটিত হইল এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড। সেই স্থানে উপস্থিত পর্যটকদিগের মধ্যে হিন্দু পুরুষদিগকে পৃথক করিয়া হত্যা করে ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সদ্য বিবাহিত। মুছিয়া যায় নববধূদিগের সিঁথির সিঁদুর। লস্কর-ই-তৈবার অধীনস্থ 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' নামক একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করিয়া নেয়। পহেলগাঁও হামলার অব্যবহিত পরেই পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ দমন এবং পাকিস্তানকে কড়াভাবে প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি শুরু করে ভারতীয় স্থল, নৌ ও বায়ুসেনা। গত ৭ মে মধ্যরাতে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশ ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি স্থানে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে রাফায়েল বিমানের সাহায্যে চরম প্রত্যাঘাত করে ভারত। ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা নিক্ষেপ করিয়া জঙ্গি শিবিরগুলিকে ধ্বংস করা হয়। ভারতের এই সামরিক অভিযানের নাম হইল— 'অপারেশন সিঁদুর'। ভারতীয় রমণীদিগের সীমন্তসীমার সিঁদুর মুছিয়া যাইবার কারণে যে গ্লানির উদ্রেক হইয়াছিল, তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ করিল অধুনা ভারত। ভারতের দ্বারা এই অভিযান শুরুর পর ভারতের উপর মুহুর্মুহু বিমান, ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় পাকিস্তান। জবাবে পাকিস্তানের একটি এফ-১৬ ও দুইটি জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান ধ্বংস করে ভারত। গত ৯ মে নয়াদিল্লি লক্ষ্য করিয়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল পাকিস্তান। সেটিকে আকাশপথেই প্রতিহত করে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। পাকিস্তানের ১১টি বিমানঘাঁটি ধ্বংস করে ভারতীয় বায়ুসেনা। দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি ঘোষিত হইলেও তাহা ছিল সাময়িক। পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করিবার কারণে গত ১২ মে জাতির উদ্দেশে ভাষণে পাকিস্তানের প্রতি কড়া বার্তা প্রেরণ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের উপর পুনরায় কোনো সন্ত্রাসী হামলা হইলে তাহা ভারতের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' ঘোষণা হিসাবে গণ্য করা হইবে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় ভারতীয় সেনা সদা বিজয়ী হইবে এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এর অভিঘাতে পাক সন্ত্রাসবাদ চিরতরে দমন হইবে এই আশা দেশবাসী রাখে।

সুভাষিতম্

সতাং হি দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতাশ্চ সজ্জনাঃ।
কালেন ফলতে তীর্থম্ সদ্যঃ সজ্জনসঙ্গতিঃ।।

সজ্জন ব্যক্তির দর্শন মাত্রেই পুণ্য লাভ হয়ে থাকে। কেননা সজ্জন ব্যক্তি স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তীর্থযাত্রার ফল পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায় কিন্তু সৎসঙ্গের ফল শীঘ্রই পাওয়া যায়।

জঙ্গি সংগঠনের মতো কিছু রাজনৈতিক দলকেও নিষিদ্ধ করা উচিত

এরপরেও বলতে হবে দেশের শত্রু কারা?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

'অপারেশন সিঁদুর' দেশের শত্রুদের নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছে। ষাট ও সত্তরের দশকে বলা হতো 'চীনের কাস্তে হাতুড়ি, পাকিস্তানের তারা। তারপরেও কি বলতে হবে দেশের শত্রু কারা?' একদল বিদেশি বামপন্থী আর সংস্কৃতির মোড়কে থাকা অ-বাম হাঁসজারুদের সম্পর্কে এটা বলা হতো। তারা চীন ও পাকিস্তানের গুণগান করে। পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পরে তাদের বংশধররা একজোট হয়েছে। ১৯৬২-তে চীন, ১৯৬৫-তে পাকিস্তান ও ১৯৭১-এ বাংলাদেশ যুদ্ধে তারা ভারত-বিরোধিতায় মগ্ন ছিল। এখন এই অপজাতদের সরানোর সময় এসেছে।

কোনো হিন্দু যদি নব্য মুসলমান হয়, সে ভীষণ হিন্দু বিদ্বেষী হয়। খুব বেশি করে নিষিদ্ধ খাদ্য খেতে শুরু করে। মহিলা- পুরুষ নির্বিশেষে মাতৃগর্ভের এই লজ্জারা মুসলমান-দরদি সাজবে বলে হিন্দু বাঙ্গালি নামের সঙ্গে পয়গম্বর মহম্মদের সম্মানসূচক প্রতীক ব্যবহার করছে। পাশাপাশি দেশবিরোধী ও মুসলমান-দরদি বক্তব্য পেশ করে সমাজের মূলস্রোত থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে। এই নির্লজ্জ মুসলমান তুষ্টীকরণের রাজনীতি আজ তাদের হারানো ভোটব্যাংক ফিরে পাওয়ার হাতিয়ার।

তারা সংস্কৃতির মোড়কে দেশবিরোধী ও উসকানিমূলক মন্তব্য করে থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাসিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে তাদের বাহবা দেওয়া হয়। ইদানীং মোল্লাবাদীরা কিছু হিন্দু মহিলা ও যুবতীদের এই কাজে লাগিয়েছে। তারা এতটাই নিকৃষ্ট যে, মুসলমানদের পাঁচ ওয়াক্ত নমাজের সময় নিয়েও তারা সামাজিক মাধ্যমে উচ্চগ্রামে প্রচার চালায়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে এই নির্লজ্জ, দেশদ্রোহীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যে নোংরামি শুরু করেছে তাতে অবিলম্বে তাদের দেশবিরোধিতার কারণে আটক করা উচিত। অনেকে আবার সমাজকর্মী সেজে ইসলামের ধ্বজা ধরেছে।

বিদেশি বামেরা চিরকাল দেশবিরোধী। তারা ধর্ম মানে না, কিন্তু ক্ষমতায় থাকার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করে। ভারতের স্বাধীনতাকে এখনও তারা ঝুটা বলেই মনে করে। এখন মুখে না বললেও 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' মনে মনে বিশ্বাস করে। ভারতীয় সংবিধানকে সমাজ বিভেদের বিকৃত দলিল বলেই মনে করে। অথচ ভারতের পতাকা নিয়ে তারা ভারতেরই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, জাতীয়তাবাদী শক্তিকে প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করে। মিথ্যা ও বিকৃত কটূক্তি করে। পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর তা প্রকাশ করতে তাদের লজ্জা করে। তাহলে কেন তাদের ভারত-বিরোধী চীন ও পাকিস্তান প্রীতি? ভারতের মধ্যে থাকা কিছু মুখোশ পরা, সংস্কৃতির মোড়কে থাকা জঙ্গি তাদের প্রত্যক্ষ মদত দেয়।

ইদানীং তারা ঘুরিয়ে নাক দেখাতে শুরু করেছে যে পাকিস্তানের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী যুদ্ধে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ভারতীয় অর্থনীতি ভেঙে যারা বাহবা কুড়োতে চায়, হঠাৎ করে ভারতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাতে তাদের দরদ দেখে সন্দেহের উদ্রেক হয়। মানুষের সামনে ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে তারা আড়াল করতে চায়। এক আজগুবি কায়দায় হিন্দুসমাজ ও ভারত সরকারকে তারা এক্ষেত্রে দায়ী করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। মোল্লাতন্ত্র যে মানুষের কোনো ক্ষতি করে না তারা সেটাই বলার চেষ্টা করে। এরাই ভারতের প্রধান শত্রু।

> **বিদেশি বামেরা চিরকাল দেশবিরোধী। তারা ধর্ম মানে না, কিন্তু ক্ষমতায় থাকার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করে।**

সাংবাদিকতা করতে গিয়ে আমি দীর্ঘদিন ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে খানিকটা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রকে অনুসরণ করে এটা পরিষ্কার বুঝেছি, এই ইসলামি সন্ত্রাসবাদের গভীরে রয়েছে এক অতি চরম মজহবি উন্মত্ততা যা কিনা খারিজি মাদ্রাসাগুলোতে শেখানো হয়। তাতে মুসলমান ছাত্রদেরকে সেই সব পরিবার থেকেই নেওয়া হয় যেখানে শিশু বয়স থেকেই অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যাবতীয় হিংস্র কার্যকলাপের পাঠ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন দেওয়া হয়েছিল মাসুদ আজহারকে। তৈরি করা হয়েছে তার মতো গ্লোবাল টেররিস্ট বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীকে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের মতে সন্ত্রাসবাদী মোল্লাতন্ত্রের তিন তার হলো 'মারকাজ' (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র), 'তাবলিগ' (বার্তা) ও 'দাওয়া' (সেবা)। অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে যে ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ভারতীয় বায়ুসেনা ধ্বংস করেছে, তার ভিতর ৪টি মারকাজ রয়েছে। ভারতের ভিতরেও বহু মারকাজ কাজ করছে। তাদের কেন্দ্রে যেমন রয়েছে ইসলামি জঙ্গিরা, ঠিক তেমনই তার চারধারে রয়েছে তথাকথিত সংস্কৃতির মোড়কে থাকা কিছু ব্যক্তি যারা আদতে সন্ত্রাসবাদের ভাবনায় জারিত। রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি এইসব ভারত- বিরোধীদের নিষিদ্ধ করতে না পারলে এই রাজ্য ও দেশ থেকে ইসলামি সন্ত্রাসের ইতি ঘটবে না।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ভারত কেন থেমে গেল? মোদী কি ভয় পেলেন?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট করে দিয়েছেন দেশের অবস্থান। ভারত যুদ্ধ চায় না, কিন্তু পায়ে পা লাগিয়ে যুদ্ধ করতে এলে কী হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সেনার শৌর্য দেখে নিয়েছে বিশ্ব। তাই চোখ রাঙানিকে আর ভয় নেই।

সমালোচকেষু দিদি,

যুদ্ধের আবহে আপনি কিছু বলেননি। আসলে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে এই প্রথম বড়ো মাপের সংঘাত। প্রশাসক হিসেবে চুপ ছিলেন। তবে দিদি আপনার চুপ থাকার বড়ো কারণ ছিল পহেলগাঁও কাণ্ডের পরে পরেই ফাঁস হয়ে যাওয়া একটি ভিডিয়ো। যেখানে পাকিস্তানের মন্ত্রীকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, ভারতে তাঁদের বন্ধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি সেই থেকেই চুপ। তবে দিদি, আমি জানি আপনি এবং আপনার দল খুব তাড়াতাড়ি শুরু করে দেবেন প্রধানমন্ত্রীর নিন্দা। আমি আগাম সে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। ভারত কেন থেমে গেল? মোদী কি ভয় পেলেন?

মোদী অবশ্য থেমে যাওয়ার কথাটা বলেছেন 'স্থগিত' শব্দের মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় বিরতি বা স্থগিত শব্দটির মধ্যে একটি সাময়িক ভাব আছে। আমি মনে করি, ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষ-বিরতিতে রাজি হলেও তা স্থায়ী হবে না। পাকিস্তান বার বার হেরেও চুপ থাকতে পারবে না। ভারত বিরোধিতা ছাড়া ওই দেশের কোনো সরকারই টিকবে না।

এটা ঠিক যে, পারস্পরিক সংঘর্ষ না হলে দুই দেশের এবং এই উপমহাদেশের মঙ্গল। তবে ভারতীয় সেনা দেখিয়ে দিয়েছে, সাধারণ মানুষের জীবন কিংবা সম্পদ রক্ষা করে আক্রমণ রচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী কত দক্ষ ও কৌশলী। আত্মসংবরণের ক্ষেত্রেও ভারতীয় সেনা কতখানি প্রশংসার যোগ্য, তাও প্রমাণিত। ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তানও যদি সমপরিমাণ বিবেচনা ও সংযম দেখায়, তা হলে যুদ্ধ-সম্ভাবনাকে পাশে সরিয়ে রেখে বিকল্প পথে সমস্যার সমাধান ভাবা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান সেটা পারবে না।

পহেলগাঁওয়ে যা ঘটেছে তারপর যে কোনো দেশই সামরিক পথে সন্ত্রাসবাদীদের উত্তর দেওয়ার কথা ভাববে। কিন্তু একই সঙ্গে, কেবল সামরিক পথেই যে দেশবাসীকে এই ব্যাপ্ত বিপদ থেকে বাঁচানো সম্ভব নাও হতে পারে, সেটা বোঝাও কঠিন নয়। প্রয়োজন ছিল, অতীব ঠাণ্ডা মাথায়, সমস্ত কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক হিসাব করে পা ফেলা, মূল লক্ষ্য অর্থাৎ জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করা। বড়ো মাপের সামরিক আঘাত-প্রত্যাঘাতের গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়লে অনেক সময়েই এই মূল লক্ষ্য গুলিয়ে যেতে পারে। বিশ্বজনমতও অপ্রীতিকর হয়ে উঠতে পারে। সেদিক থেকে দেখলে 'অপারেশন সিঁদুর' যেমন ভারতের পক্ষে আবশ্যিক ছিল, সীমিত সময়কালে সেই 'অপারেশন'কে বেঁধে রাখাও ছিল অত্যন্ত জরুরি কাজ। দুটি কাজেই ভারত সফল। সেই সাফল্য ভারতীয় সেনা এবং ভারত সরকারের।

প্রশ্ন উঠেছে, বাইরের কোনো দেশের শীর্ষনেতা কেন যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় মধ্যস্থতা করলেন। নয়াদিল্লির আগেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কেন 'যুদ্ধ-বিরতি' বলে দিলেন। পুরনো ইতিহাস থেকে নানা দৃষ্টান্ত পেশ করেও বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমালোচনা করছেন। এটা নিয়ে দিদি, কয়েকটি কথা স্পষ্ট বলা দরকার।

কাশ্মীর নিয়ে ভারতের দীর্ঘকালীন দাবিটি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তা নিশ্চিত করার ভার অবশ্যই দেশের বর্তমান সরকারের। এ কেবল নেতা, দল বা সরকারের সম্মানের বিষয় নয়, দেশের সম্মানের বিষয়। কিন্তু এও সত্য যে, ভারত-পাকিস্তানের সামরিক সংঘর্ষ বা যুদ্ধে মধ্যস্থতা করা, আর কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানে অর্থময় ভূমিকা পালন করা— এই দুইটিকে একেবারে এক করে দেখা অনুচিত। পুরনো সময়ের সঙ্গে এখনকার তুলনা টানাও অসঙ্গত। গত কয়েক দশকে বিশ্বকূটনীতির ছবিটি প্রভূত পালটেছে। ফলে এখন যদি কোনো মধ্যস্থতার সূত্রেই সংঘর্ষ থেকে শান্তির পথে দুই বিবদমান দেশকে টেনে আনা হয়, সেই পদক্ষেপকে স্বাগত জানানোই জরুরি। সুতরাং, ঠিকই করেছেন মোদী। তিনি নিজে ঘোষণা করলে এটা মনে হতো, যে ভারত নিজেদের দাবি থেকে সরে আসছে। এখন এটা সকলের জানা যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্যই ভারতে 'অপারেশন সিঁদুর' স্থগিত করেছে।

মোট কথা, বৃহত্তর সংঘর্ষে ভারতীয় জনসমাজকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই, তাতে সুফল বা নিরাপত্তার আশাও নেই। এখন প্রয়োজন, শান্তির পথে দৃঢ় ও অবিচলিত থেকে, কূটনৈতিক দক্ষতা দেখিয়ে দেশবিরোধী সন্ত্রাসকে প্রতিহত ও বিনাশ করা। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণে বলেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে এবার কথা হবে— সন্ত্রাস বিষয়েই, পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই। স্পষ্ট করে দিয়েছেন দেশের অবস্থান। ভারত যুদ্ধ চায় না, কিন্তু পায়ে পা লাগিয়ে যুদ্ধ করতে এলে কী হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সেনার শৌর্য দেখে নিয়েছে বিশ্ব। তাই চোখ রাঙানিকে আর ভয় নেই। □

অতিথি কলম

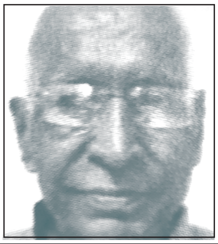

মধুভাই কুলকর্ণী

এক মন্ত্রে সঞ্চারিত তন্ত্র

প্রাচীনকাল থেকে আমরা এই ভারতভূমিতে একটি প্রগতিশীল ও সুসংস্কারিত সমাজ রূপে বসবাস করছি। সভ্য ও সুসংস্কৃত সমাজ জীবন এখানেই প্রথম গড়ে ওঠে। তার পিছনে এখানকার ভৌগোলিক অবস্থানটাও প্রধান কারণ। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে সমুদ্র আমাদের রক্ষা করছে। এই ভূমি অজস্র বনস্পতি, নদ-নদী, বিশাল কৃষিক্ষেত্রে পূর্ণ। সামাজিক জীবন সহজ-সরল, সুরক্ষিত ও শান্ত প্রকৃতির। এই কারণে অধ্যয়ন, চিন্তন, গবেষণা এবং নতুন নতুন প্রয়োগ করার অনুকূল পরিবেশ ছিল। প্রাচীন 'প্রজ্ঞা প্রবাহ' নিশ্চিতরূপে গতিমান ছিল। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভাবনও এই ভূমিতে হয়েছে। আমি কে? জগৎ মানে কী? আমি ও এই জগতের মধ্যে সম্পর্ক কী? আমার জন্মের প্রয়োজন কী? জন্ম-মৃত্যু কেন? এসব প্রশ্ন যেকোনো মানব সমাজে উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এসব প্রশ্নের যে উত্তর আমাদের পূর্বপুরুষেরা হাজার হাজার বছর আগে অনুসন্ধান করে গেছেন তা আজও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা হাজার হাজার বছর আগে প্রমাণ করে গেছেন, 'ব্রহ্মাণ্ডের গঠন অখণ্ড মণ্ডলাকার (অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং...), আমি অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মা। সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড একই চেতনা থেকে নির্গত (সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম), সমগ্র মানবজাতি এই ব্রহ্মাণ্ডের অবিভাজ্য অঙ্গ (তৎ ত্বম্ অসি)।' মানুষের মন ও বুদ্ধির কল্পনাশক্তি এত আশ্চর্যজনক যে তারা এই তত্ত্বের অনুভব করতে সমর্থ। এতেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা।

আমাদের সংবিধানের মূল গ্রন্থে ২৪টি ছবি সন্নিবিষ্ট রয়েছে। প্রথমটিতে মহেঞ্জোদরোর খননকার্যে প্রাপ্ত হৃষ্টপুষ্ট বৃষভ চিত্র এবং দ্বিতীয়টিতে রয়েছে গুরুকুলের চিত্র। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান ও ঋষি প্রধান। কৃষি অর্থাৎ চাষ এবং ঋষি অর্থাৎ জ্ঞান, সত্যের জ্ঞান। 'আমি শুধু শরীর নই', এই বোধ থাকা প্রয়োজন। বুঝতে হবে যে এক চৈতন্য তত্ত্বই সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছে। যেমন আমাদের খিদে পায়, অন্যদেরও খিদে লাগতে পারে তা বুঝতে হবে। উপনিষদের একটি গল্পে রয়েছে, গুরুকুল থেকে শিক্ষা শেষ করে দুই ভাই বাড়ি ফিরছে। গুরুকুল থেকে বেরনোর সময় রাস্তায় খাওয়ার জন্য তাদের রুটি -তরকারি পুঁটলি দেওয়া হয়েছিল। দুপুরে খাওয়ার সময় তারা পুঁটলিটা খোলে। তখনই এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এসে রুটি চায়। ছোটোভাই রুটি দিতে অস্বীকার করে। সে বলে, রুটি আমাদেরই কম পড়বে, তোমাকে কোথা থেকে দেব? দাদা ভাইয়ের পিঠে চাপড় মেরে বলে, ১২ বছর বিদ্যার্জনের পর তত্ত্বমসির সত্যটাকেই ভুলে গেলে? সকলের মধ্যে একই চৈতন্য রয়েছে। একে রুটি না দিলে তোমারও রুটিতে হাত দেওয়ার অধিকার নেই। গল্পটির শিরোনাম 'তত্ত্বমসি'।

ভারতে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং 'তত্ত্বমসি'র মতো বিশ্বজনীন ও শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনশৈলীর বিকাশ ঘটে। তাকেই আধ্যাত্মিক জীবনশৈলী বলা হয়। আধ্যাত্মিক জীবনশৈলী হলো সর্ব মঙ্গলকারী, পরিবেশের পরিপূরক, দীর্ঘকাল উপযোগী ও মানবতাবাদী। আধ্যাত্মিক ভাবনা তত্ত্বমসির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 'আমি নয় তুমি' এই ভাবনা ব্যবহারিক জীবনের আচরণে, সমস্ত সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপেও প্রভাবী ছিল। সমাজজীবনে বৈষম্য, উচ্চ-নীচ, ভেদভাবের কোনো স্থান ছিল না। জীবন সুখ-সমৃদ্ধি, জ্ঞান ও আনন্দ প্রদানকারী হওয়া উচিত। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতে শান্ত, সমরস, সহজ-সরল সমাজজীবন চলে আসছে। বর্তমানে আমাদের দেশে সমাজের অবস্থা দেখে বিশ্বাস করার উপায় নাই যে, সকলের কল্যাণকারী, বিভেদমুক্ত, সমরস সমাজ এখানে কখনো ছিল! বুঝতে পারা অসম্ভব যে সমরসতার সেই ভাবনা কবে আর কীভাবে হারিয়ে গেল! 'আমি নয় তুমি'র ভাবনা লুপ্ত হয়ে তার জায়গায় অহংকারী জীবনশৈলী প্রধান হয়ে উঠেছে। শিক্ষা, সম্পত্তি, পরিবার, নিজ গোষ্ঠীর অহংকার প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। ব্যবসা, ভাষা, পোশাক প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই অহংকার প্রদর্শন ব্যক্তির স্বভাবে পরিণত হয়েছে। 'আমি ও আমার' ভাবনা বলবতী হয়েছে। মানুষে মানুষে দূরত্ব বেড়েছে। এমতাবস্থায় বিদেশি কুচক্রের কাছে দেশ টিকে থাকতে পারে না। এজন্যই দেশ প্রায় হাজার বছর পরাধীন থেকেছে। বংশগৌরব, উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, অনৈতিকতা প্রভৃতি নানান

> "হিন্দুধর্ম খুব সাহসের সঙ্গে বলে, যেখানে সকলেই ঈশ্বরের রূপ সেখানে ভেদাভেদ করা সম্ভব নয়। এই তত্ত্ব হিন্দুধর্মকে অসাধারণ শক্তি প্রদান করেছে।"

বৈষম্যের রোগ হিন্দু সমাজে বাসা বেঁধেছে।

পুরনো রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন

স্বামী বিবেকানন্দ, মহর্ষি দয়ানন্দ, গান্ধীজী, বীর সাভারকর, ছত্রপতি শাহুজী মহারাজ, মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে, ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, সন্ত নারায়ণ গুরু প্রমুখ মহাপুরুষ এই রোগ থেকে আমাদের সমাজকে মুক্ত করতে নানা প্রচেষ্টা করে গেছেন। এই রোগ সমাজের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, তা এখন সামান্য শিথিল হলেও, পুরনো রোগ হওয়ার কারণে মানুষের ভেতর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এর নিরাময় শুধুমাত্র কয়েকজন মহাপুরুষদের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। মানসিক রোগাক্রান্ত প্রতিটি ব্যক্তির রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার তীব্র ইচ্ছা থাকা চাই। এই রোগ সম্পূর্ণ সমাজ থেকে 'জাতি ভাঙো অহংকার ছাড়ো'-র মতো স্লোগান দিয়ে আন্দোলন করলে হবে না, বরং তার জন্য কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। রোগমুক্ত ও বন্ধুভাবে সিক্ত ঐক্যবদ্ধ সমাজ না নির্মাণ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে দীর্ঘদিন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। এটাকে অসাধ্য না ভেবে হোমিয়োপ্যাথির মতো চিকিৎসা করতে হবে।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সমাজের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ও পরাজয়ের কারণ গভীরভাবে চিন্তা করেন। উচ্চ-নীচ ও ছুঁতমার্গ তৈরি হওয়ার কারণে সমাজের মানুষ পরস্পর দূরে চলে যাচ্ছিল। বর্ণ অহংকারের ভাব তো ছিলই, জাতি ও উপজাতির ভেদও ছিল পরিপূর্ণ। মুম্বাইয়ের ধারাবী বস্তিতে মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো এবং জুতা বানানো দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াতই নেই, কেউ কারও ঘরে জল পর্যন্ত খায় না। তাদের মধ্যে রুটি-বেটির সম্পর্ক তো দূরের কথা। এই বিভেদের তল খোঁজা অসম্ভব। ডাক্তারজীর নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সমাধান সকলের থেকে ভিন্ন এবং সবার গ্রহণযোগ্য। 'সমাজ বন্ধুদের পরস্পর দূরে সরে যাওয়া স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। এমন কোন বিষয় আছে, যা মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে একসঙ্গে আসার প্রেরণা জোগাবে? তা হলো, ভারত আমাদের মা, আমরা সকলে তাঁর সন্তান, ভারতমাতাকে বৈভবসম্পন্ন করা আমাদের কর্তব্য।' তাঁর এই ভাবনা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রেরণা দিয়ে যাবে। ডাক্তারজী প্রয়োগ হিসেবে সঙ্ঘ শাখা শুরু করেন। তিনি আরও একটি প্রেরণাসূত্র সঙ্ঘ শাখার সঙ্গে যুক্ত করেন— 'তুমি হিন্দু আমি হিন্দু, আমরা দুজনেই বন্ধু।' জাতি বা বর্ণের ভাবনা এখানে নেই। এক ঘণ্টার শাখায় খেলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বালক-কিশোর-যুবকেরা খেলার আকর্ষণে শাখায় আসে। দারুণ একটা খেলা হলো কবাডি। এই খেলায় মোর হওয়ার পরেও বেঁচে ফিরে আসে অর্থাৎ অমরত্বের বার্তা। অস্পৃশ্যতার নাম-গন্ধহীন সমরসতার জলপ্রপাত। শাখা হলো হোমিয়োপ্যাথির মিষ্টি দানা।

শাখা সেই 'তত্ত্বমসি'র শাশ্বত ধারণায় চলে। অপরের চিন্তা করাই শাখার সফলতার চাবিকাঠি। বন্ধু মনে করে একে অপরের বাড়িতে স্বাভাবিক যাতায়াত, কেউ অসুস্থ হলে তার জন্য বিশেষ চিন্তা করা, বিপদে পাশে থাকা প্রভৃতি সূত্র সফলতার কারণ। এক স্বয়ংসেবক অন্য স্বয়ংসেবকের রান্নাঘর পর্যন্ত সম্পর্ক থাকা উচিত। শাখা মানে সমরসতার ব্যবহার। 'আমি নয় তুমি'র ব্যবহারিক স্থান হলো শাখা। শরীরে রক্তসংবহনের মতো গুরুত্বপূর্ণ হলো সমাজে সমরসতা। রক্তপ্রবাহে বাধা এলে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি বা ওপেন হার্ট সার্জারি করতে হয়। ড. আম্বেদকর বাইপাস সার্জারি করে বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন। সমরসতার সরস্বতী ধারা প্রবাহিত করে, সমাজের ছোটো বড়ো বাধা দূর করে, বন্ধুভাবের দ্বারা তত্ত্বমসির ধর্মীয় ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। শাশ্বত সত্যের উপর সমাজজীবনের পুনর্রচনা করতে হবে। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সবরকম বিভেদমুক্ত সমরস সমাজ গঠন করা। এই অবস্থাকেই সঙ্ঘ 'হিন্দু সংগঠন' বলেছে।

অস্পৃশ্যতা সংগঠন শাস্ত্র থেকে দূরে

ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী ও বালাসাহেব দেওরসজী তিনজনে সঙ্ঘের প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত সঙ্ঘের প্রথম ৭০ বছর এই তিনজন স্বয়ংসেবক এক-এক করে পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাছে তাঁদের পথনির্দেশ অত্যন্ত প্রেরণা সঞ্চারকারী। উদাহরণ স্বরূপ, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বলেন, 'আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের কাজ, অতএব সমাজের কোনো অঙ্গের উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সকল হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে আমাদের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক হওয়া উচিত। কোনো হিন্দুকে হীন মনে করে তাকে আমাদের থেকে দূর করে দেওয়া পাপ। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকের মনে এমন সঙ্কুচিত ভাবনা উদয় হওয়া কখনোই উচিত নয়। ভারতপ্রেমী প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের ব্যবহার বন্ধুত্বেরই হওয়া উচিত। লোকেরা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবছে, সেটা বড়ো কথা নয়। আমাদের ব্যবহার যদি আদর্শ হয় তবে সকল হিন্দু আমাদের দিকে আকৃষ্ট হবে।' তিনি আরও বলেন, 'সংগঠন শাস্ত্র অস্পৃশ্যতাকে চেনে না, তা কেউ ব্রাহ্মণ হোক বা সাফাই কর্মচারী, ধনী বা গরিব, বিদ্বান বা মূর্খ — সকলের সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ সুলভ। কারও নাগপুরে জন্ম হোক বা গঙ্গোত্রীতে, সঙ্ঘে প্রত্যেক হিন্দুর প্রবেশাধিকার রয়েছে।'

এই অনুভব শাখার কার্যপদ্ধতির কারণে স্বয়ংসেবকদের হতে শুরু করে। ১৯৩৪ সালে ওয়ার্ধা সঙ্ঘ শিবিরে সমাজের প্রতিটি বর্গের স্বয়ংসেবককে দেখে এবং সবার একসঙ্গে থাকা, খাওয়া ও পানীয় জলের ব্যবস্থা দেখে গান্ধীজীও প্রভাবিত হন। ১৯৪০ সালে নাগপুরে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে সারা দেশ থেকে আসা প্রায় ১৫০০ স্বয়ংসেবক বন্ধুভাব নিয়ে ৪০ দিন একসঙ্গে থাকেন। পরম পূজনীয় ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী ও বালাসাহেব দেওরসজী এসব অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁরা বিভেদ মুক্ত, সমরস, একরস হিন্দু সমাজের সেই দৃশ্য অনুভব করছিলেন।

সমরসতা-সরস্বতীর লুপ্ত প্রবাহ ডাক্তারজীর যজ্ঞাহুতির কারণে পুনঃপ্রবাহিত হয়। শ্রীগুরুজী তাকে আরও গতিমান করেন এবং সমগ্র ভারতে প্রবাহিত করেন। শাখা ৭০০ থেকে ১১,০০০-এ পৌঁছায়। সঙ্ঘকাজ সেই গতিতে বাড়তে থাকলে সমরস সমাজের ছবি অনেক আগেই দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু অদৃষ্টের কারণে এই কার্যপদ্ধতি নানা বাধার সম্মুখীন হয়। স্বাধীন ভারতের সরকার গান্ধীহত্যার মিথ্যা অভিযোগে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। শাখা বন্ধ হয়, সঙ্ঘপ্রবাহ থমকে যায়। মানুষের মধ্যে মিথ্যা প্রচার করা হয়

'সঙ্ঘ হিংসার সমর্থনকারী, বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার সমর্থক এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী'।

কিন্তু সম্পূর্ণ তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত সঙ্ঘকে নির্দোষ ঘোষণা করে। তা সত্ত্বেও নিষেধাজ্ঞা সরাতে সত্যাগ্রহ করতে হয়। শেষপর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়, আবার শাখা শুরু হয়। একরস-সমরস সমাজ নির্মাণের ধ্যেয় সামনে রেখে সঙ্ঘের শাখা পুনরায় শুরু হয়। কিন্তু সমাজের মধ্যেকার পূর্ব ধারণা ও অপপ্রচারের কারণে সমাজ ও সঙ্ঘের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়। সমরসতার প্রবাহ স্থানে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সেসময় পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ছিলেন শ্রী মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। তাঁর জীবন আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে 'একই চৈতন্য সর্বত্র বিরাজমান'— এই ভাবনায় ভরপুর ছিল। কারামুক্তির পর তাঁর প্রথম ভ্রমণে স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশে পাথেয় দেন, 'গত দেড় বছর ধরে বন্ধ থাকা কাজ আমাদের পুনরায় উৎসাহের সঙ্গে শুরু করতে হবে। আমরা কারও প্রতি বিদ্বেষভাব রাখব না। শুদ্ধ ও পবিত্র মনে, ধৈর্য ধরে কিন্তু গতির সঙ্গে কাজ করে প্রতিবন্ধকালের ঘাটতি পূর্ণ করতে হবে। আমাদেরই সমাজবন্ধুদের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাবনা রাখা উচিত নয়। যা কিছু হয়েছে, তা সব ভুলে যেতে হবে। ... সকলকে একত্রিত করে, পন্থ-জাতি প্রভৃতির ভিত্তিতে নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের চিরন্তন ভিত্তি নিয়ে এক সুসূত্র, একরস, সংগঠিত সমাজ নির্মাণ করতে হবে। কোনোরকম ভেদাভেদ রাখা চলবে না। এটাই সঙ্ঘের ভাবনা। অস্পৃশ্যতা বা ছুঁতমার্গ সবর্ণদের সঙ্কুচিত মনের রোগ। অস্পৃশ্যতা সমাপ্ত করা অর্থাৎ সবর্ণদের সঙ্কুচিত মানসিকতার পরিবর্তন করা।'

সমাজের অধিকাংশ লোকের ধারণা হলো, 'অস্পৃশ্যতা ধর্মের অঙ্গ এবং ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করা মহাপাপ'। নিজেদের উচ্চবর্ণ মনে করা ব্যক্তি তথাকথিত অস্পৃশ্য ব্যক্তির সঙ্গে সমব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত নয়। রাজস্থানে এক হরিজন যুবককে গোঁফ রাখার কারণে এত মারা হয় যে তার মৃত্যু ঘটে। এই খবর কিছুদিন আগে সংবাদ পত্রে পড়েছিলাম। কেন, গোঁফ রাখা কি কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়দের অধিকার? অস্পৃশ্যতা ধর্মে মান্য নয়। শ্রীগুরুজী তা নির্মূলের জন্য চেষ্টা করে গেছেন। ১৯৬৯ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উডুপী অধিবেশনে উপস্থিত সমস্ত ধর্মাচার্য একমত হয়ে ঘোষণা করেন, অস্পৃশ্যতা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্থান পাবে না। তাঁরা সমাজকে মন্ত্র দেন, 'হিন্দবঃ সোদরা সর্বে'।

আমি ৪০ বছর আগে বেনারস হিন্দু বিদ্যাপীঠে পড়তাম। তখন এক হরিজন ছাত্র আমাকে তার খাওয়াদাওয়ার সমস্যার কথা বলে। আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করি। সকলে আমার সেই বন্ধুর নিঃশুল্ক খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে। দু'বছর সেই ব্যবস্থা চলে। জীর্ণ শীর্ণ জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা ছেড়ে এক বর্ণের নির্মাণ করার সময় হয়েছে। তার থেকেই নতুন সমাজ রচনা হবে। পূজনীয় বালাসাহেবজী বলেছেন, 'সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের হিতের জন্য হিন্দু সমাজকে একাত্ম, চরিত্রবান, স্বাভিমানী, পরাক্রমী ও স্বাবলম্বী করার জন্য কাজ চলছে। কোনো একটি জাতের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। সকলে বুঝতে পারছেন যে, আমরা জাতভেদ, ছোঁয়াছুঁয়ি মানি না। বর্ণভেদ আমরা স্বীকার করি না। সমগ্র হিন্দু সমাজ এক ও অভিন্ন, তা আগে থেকেই আমরা বিশ্বাস করি আমাদের বিশেষ কার্যপদ্ধতির দ্বারা জাতপাতের ভাবনা সমাপ্ত করে চলেছি। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, জাতিতে-জাতিতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, ভাষা প্রভৃতির মধ্যে যতটা সামঞ্জস্য ও সৌহার্দ্য সঙ্ঘের মধ্যে রয়েছে ততটা আর কোথাও নেই। সামাজিক বৈষম্যের কারণেই অস্পৃশ্যতার মতো রোগ সৃষ্টি হয়েছে। তা আমাদের কাছে দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যের।

অস্পৃশ্যতা পাপ না হলে পৃথিবীতে কোনো কিছুই পাপ নয়। তা সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হওয়া উচিত। এই দেশের উদ্ধারের জন্য হিন্দু সংগঠন আবশ্যক এবং হিন্দু সংগঠনের জন্য সামাজিক সমতা আবশ্যক। এখানে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা একরস সমাজ চায় তারা মহিলাদের দুর্লক্ষ্য করতে পারে না। সমাজে শতকরা ৫০ ভাগ মহিলা। সমাজের এই ভাগ দুর্বল থাকবে, তা মেনে নেওয়া যায় না। উৎপাদন থেকে হওয়া লাভ সমগ্র সমাজে এভাবে পৌঁছানো উচিত, যাতে সাধারণ মানুষের জীবনস্তর উন্নত হয়।'

বর্তমান সঙ্ঘের স্বরূপ প্রথম তিন সরসঙ্ঘচালকের পথনির্দেশ অনুসারে বিকশিত হয়েছে। সমাজের বহু ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকেরা সংগঠন গড়ে তুলেছেন। সমরসতা ও একরসতার সাংগঠনিক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। অসবর্ণ বিয়েতে সঙ্ঘের আপত্তি নেই। অনেক স্বয়ংসেবক এ ধরনের বিয়ে করেছেন। শ্রীগুরুজী, বালাসাহেবজী এমন বহু বিয়েতে উপস্থিত থেকেছেন।

দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন, গতি বৃদ্ধি

১৯৪৮ সালের নিষেধাজ্ঞার কারণে সঙ্ঘের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে জরুরি অবস্থার সময় নিষেধাজ্ঞার কারণে সমাজের সঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন হয়েছে, কাজ দ্বিগুণ গতিতে বেড়েছে। বর্তমানে শাখার সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০। শতবর্ষের যাত্রায় সমরসতা- সরস্বতীর এই প্রবাহ প্রত্যেক গ্রাম পর্যন্ত যাতে পৌঁছায়, তার জন্য চেষ্টা চলছে।

আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শীঘ্রই সাকার হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি বলেন, 'ঈশ্বর ভক্তির শুভ কবচ ধারণ করে দীন-দরিদ্রের প্রতি অপার করুণা নিয়ে সহস্র যুবক-যুবতী হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছুটে বেড়াবে। তারা মুক্তি, সেবা, সামাজিক উত্থান, সবরকম সমানতার আহ্বান করবে, এই দেশ পৌরুষ যুক্ত হয়ে উঠবে এমনটা আমার বিশ্বাস।' 'তত্ত্বমসি'র সত্যই সামাজিক সমরসতা, বন্ধুভাব, সমতাপূর্ণ ব্যবহারের ভিত্তি হতে পারে। 'বহিষ্কৃত ভারত'-এর একটি সংখ্যায় ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর লিখেছেন, 'হিন্দুধর্মের সিদ্ধান্ত খ্রিস্টান ও ইসলাম মতের সিদ্ধান্তের তুলনায় বহুগুণ বেশি সমতার সিদ্ধান্তের পোষক। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এবং ঈশ্বরের স্বরূপও। হিন্দুধর্ম খুব সাহসের সঙ্গে বলে, যেখানে সকলেই ঈশ্বরের রূপ সেখানে ভেদাভেদ করা সম্ভব নয়। এই তত্ত্ব হিন্দুধর্মকে অসাধারণ শক্তি প্রদান করেছে।' 'তত্ত্বমসি'র আধ্যাত্মিক সত্যের বিষয়ে দেশজুড়ে সমাজ জাগরণ করতে হবে। যা সঙ্ঘের শাখায় আছে, তা সমাজেও পরিব্যাপ্ত করতে হবে, এর জন্য সঙ্ঘে সমরসতা গতিবিধি নামে বিভাগ আরম্ভ করা হয়েছে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

জাতগণনা সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে মজবুত করে সামাজিক ন্যায়ের পথ প্রশস্ত করবে

ধর্মানন্দ দেব

ভারতীয় সমাজ এক বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় পরিসর, যেখানে অসংখ্য জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির সহাবস্থান ঘটেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষত ব্রিটিশ শাসনকালে, এই বৈচিত্র্যকে একটু সুসংগঠিত সামাজিক কাঠামোর আওতায় এনে বিভাজনের রূপ দেওয়া হয়। এই বিভাজন কখনো ধীরে ধীরে, কখনো-বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শক্তিশালী হয়েছে। জাতপাতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, বৈষম্য এবং একে অপরের প্রতি অবজ্ঞার মানসিকতা ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

ভারতীয় সমাজে 'জাত' শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক বা আঞ্চলিক ধারণা নয়; বরং এটি রাজনীতি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও একটি কেন্দ্রীয় ইস্যু। ব্রিটিশরা ১৮৭১-৭২ সালে প্রথমবারের মতো বর্ণভিত্তিক গণনার সূচনা করে ভারতীয় সমাজকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বোঝার জন্য। ১৮৮১ সালের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জনগণনাতে বর্ণের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর একাধারে পাঁচ দশক ধরে, প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনাতে জাত-বর্ণভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সর্বশেষবার, ১৯৩১ সালের জনগণনায় সারা দেশে ৪,১৪৭টি জাত ও উপজাত গণনা করা হয়। যদিও ১৯৪১ সালের যুদ্ধকালীন জনগণনাতেও জাত ও বর্ণসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা আর কখনো প্রকাশ করা হয়নি। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনা করা হবে না, শুধুমাত্র তফশিলি জাতি ও উপজাতির (এসসি/এসটি) তথ্য সংগ্রহ চালু থাকে।

ভারতের ঐতিহ্যগত জাতপাতের মূল ভিত্তি ছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো, যা পরবর্তীতে একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্র— এই জাতভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। যদিও প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সমাজের মধ্যে এই শ্রেণীবিভাগ অনেকটা ন্যায় ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল, তা ক্রমশ এক রকম বৈষম্য ও শোষণের চেহারা নেয়।

> **আজ প্রয়োজন এমন এক সুনির্দিষ্ট নীতিগত ও আইনি কাঠামোর, যা একদিকে ঐতিহাসিক বৈষম্য দূর করবে। অন্যদিকে জাতভিত্তিক বিভাজনকে স্থায়ী সামাজিক পরিকাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠা না করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের পথ দেখাবে।**

ভেদভাবের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং বৈষম্য তৈরি করা হয় যা শিক্ষার, চাকরির এবং অন্যান্য সুযোগ- সুবিধায় প্রভাব ফেলতে থাকে।

যখন জাতের প্রসঙ্গ ওঠে, তখন তা সাধারণত এই সমাজের ভেতরে একটি স্পর্শকাতর ও গোপনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণত রাস্তাঘাটে কেউ কাউকে প্রথমবার দেখা করলে আমরা প্রশ্ন করি, 'আপনার নাম কী?' বা 'আপনি কোথাকার লোক?' কিন্তু কখনোই প্রশ্ন করি না, 'আপনি কোন জাতের?' কারণ এই প্রশ্নের মাধ্যমে জাত নিয়ে এক ধরনের সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হতে পারে। ভারতের সামাজিক কাঠামো এতটাই জটিল যে, এই জাত নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করা সামাজিক অস্বস্তির সৃষ্টি করতে পারে, তবে যখন প্রশ্ন আসে সরকারি চাকরি বা শিক্ষায় সুযোগের, তখন জাতের পরিচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়ে দাঁড়ায়। এটা আমাদের সমাজের পরিপূর্ণতার ছবি। একদিকে জাত নিয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল, অপরদিকে জাতভিত্তিক সুযোগসুবিধার বিষয়টিও আমাদের সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক ছিল। তবে দেশের বৃহত্তর জনগণের জন্য বিশেষভাবে এসসি, এসটি ও বাকি অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কিছু সুযোগ তৈরি করার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষার সুযোগ এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া

ফঃ ২

শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষার সুযোগ এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে একটি সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তবে, যখন এই সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটে, তখন এটি শুধু সমাজের জন্য একটি সুযোগের সৃষ্টি করেছিল, বরং এটি দ্রুত রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে উঠেছিল। ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারত প্রথম লোকগণনার সময় সংগৃহীত তথ্যে হিন্দু ও মুসলমান ছাড়াও তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তফশিলি জাতি ও উপজাতি ব্যতীত অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যদের গণনা আলাদাভাবে করা হয়নি। তবে ১৯৬১ সালের আগেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে জনগণনা সংক্রান্ত তাদের নিজস্ব সমীক্ষা পরিচালনা করার এবং ইচ্ছা করলে রাজ্যভিত্তিক অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকা সংকলনের অনুমতি দিয়েছিল।

এর মধ্যে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুরের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ১৯৭৮ সালে বিহার রাজ্যে প্রথম ২৬ শতাংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যা জাতভিত্তিক সংরক্ষণের নতুন যুগের সূচনা করে। কর্পূরী ঠাকুরের এই পদক্ষেপ, যদিও সামাজিক ন্যায়ের উদ্দেশ্যে ছিল, তা রাজনীতির মঞ্চে একটি নতুন বাঁক নেয়। সরকারি চাকরি ও শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা এই সময়ে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাজনৈতিক পদক্ষেপ হয়ে ওঠে, যা না শুধুমাত্র সমাজের উন্নতির দিকে নিয়ে যায়, বরং দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতাও পরিবর্তন করে। এই পদক্ষেপের পর কর্পূরী ঠাকুরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শুরু হয়। বিশেষত, বিহারে জনসঙ্ঘের (বর্তমান বিজেপি) নেতৃত্বাধীন জোট সরকার কর্পূরী ঠাকুরের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জনসঙ্ঘের প্রতিরোধের ফলে বিহারের জোট সরকার ভেঙে যায়, তবে কর্পূরী ঠাকুর তাঁর অবস্থানে অটল থাকেন এবং এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে নিজের লড়াই চালিয়ে যান। তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপ দেশব্যাপী এক নতুন রাজনীতি সৃষ্টি করে, যা বিশেষত মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের পরবর্তীতে ভারতজুড়ে আলোচনায় আসে।

১৯৯০ সালে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতের জাতভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি বড়ো পরিবর্তন ঘটে। মণ্ডল কমিশন সরকারের উদ্দেশ্য রাখে যে, পিছিয়ে পড়া জনগণের উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এটি ছিল একটি মূল ভিত্তি, যার ভিত্তিতে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার কার্যক্রম শুরু হয়।

এই পরিবর্তনের মাধ্যমে, একটি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা উদ্ভাবিত হয়। তখন ভারতীয় সমাজে এমন এক যুগের সূচনা হয়, যেখানে জাতভিত্তিক রাজনীতি প্রধান হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালে, প্রধানমন্ত্রী ভিপি সিংহের নেতৃত্বে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার পর, ভারতজুড়ে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধিতা শুরু হয়। বিজেপি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, বিশেষ করে লালকৃষ্ণ আদবাণী ছিলেন প্রতিবাদকারীদের মধ্যে অন্যতম। তার নেতৃত্বে এই বিরোধিতা চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং সারা দেশে তিনি রথযাত্রা শুরু করেন। সেই সময়েই আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে রথযাত্রায় যোগ দিয়েছিলে।

বর্তমানে ভারতের সরকারি চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে জাতভিত্তিক সংরক্ষণের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। ২০২১ সালের তথ্য অনুসারে, ভারতের মোট জনগণের মধ্যে ১৫.৪ শতাংশ এসসি, ৭.৪ শতাংশ এসটি এবং ২৭ শতাংশ হওয়া উচিত ওবিসি। এই শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ সংরক্ষিত থাকে, যা সরকারি চাকরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সুবিধায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে এর সঙ্গে রয়েছে একটি বড়ো বিতর্ক— সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এতে একদিকে সুবিধা সৃষ্টি হলেও, অন্যদিকে সমাজে বিভাজন ও বঞ্চনা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

সুতরাং, জাতভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে একদিকে দেখা যায় সামাজিক ন্যায়ের একটি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে, যা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। অপরদিকে, এর রাজনৈতিক ব্যবহার ও অপব্যবহার অনেক সময় সমাজে নতুন ধরনের বৈষম্য ও বিভাজনের বীজ বপন করে। যে সংবেদনশীল প্রশ্ন আমরা দৈনন্দিন জীবনে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাই না— 'আপনি কোন জাতের?' —সেই প্রশ্ন শিক্ষাঙ্গন ও সরকারি চাকরিতে প্রবেশের মূল চাবিকাঠি হয়ে ওঠে। তাই আজ প্রয়োজন এমন এক সুনির্দিষ্ট নীতিগত ও আইনি কাঠামোর, যা একদিকে ঐতিহাসিক বৈষম্য দূর করবে। অন্যদিকে জাতভিত্তিক বিভাজনকে স্থায়ী সামাজিক পরিকাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠা না করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের পথ দেখাবে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

কাশ্মীরে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ‘সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না?’

দেবজিৎ সরকার

১৯৮৯ সাল থেকে পাক মদতে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকায় শুরু হওয়া পাক সন্ত্রাস, ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নরসংহার ঘটিয়ে উপত্যকাকে হিন্দুশূন্য করা, উপত্যকায় শিখ নরসংহার, পরপর সন্ত্রাসবাদী হামলা, মুম্বই বিস্ফোরণ, কান্দাহারে বিমান হাইজ্যাক, মাসুদ আজহারের মুক্তি, ভারতীয় সংসদ ভবন আক্রমণ, আফজল গুরু, মুম্বই হামলা, উরি-পুলওয়ামা-পহেলগাঁও, জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে একের পর এক শেলিং-এর মধ্যে কোনটা সেকুলার আক্রমণ? বঙ্গপ্রদেশে ও তারপরে ভেঙে চলে আসা এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া হিন্দু হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকে লুকানোর চেষ্টা হয়েছে এবং এই সন্ত্রাসবাদকে ‘ইসলামি সন্ত্রাসবাদ’ বলে স্বীকার করতে বাধা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণা হবে।

যে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ প্রত্যেক মুহূর্তে ভারতবর্ষের বুকে আক্রমণ শানিয়ে গেছে এবং আরও অদ্ভুত ব্যাপার যে বঙ্গপ্রদেশের বিভাজন হয়েছিল প্রায় পঁচিশ লক্ষের ওপর হিন্দু মহিলার সম্মান এবং দেড় কোটি হিন্দু পুরুষের হত্যার কারণে, সেই অত্যাচারী ও হত্যাকারীরা প্রত্যেকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদী ছিল--- পশ্চিমবঙ্গের স্বঘোষিত সাংস্কৃতিক জ্যাঠামশাইরা তা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। পঞ্জাব প্রদেশেও অনুরূপ আক্রমণ হয়েছিল, কিন্তু বিভাজনের পরে পঞ্জাব প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনবিনিময়ের মাধ্যমে হিন্দু ও শিখ নারী-পুরুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন। তার কারণ বিধাতার আশীর্বাদে পঞ্জাব সেকু-মাকু রোগমুক্ত ছিল। ‘ওপারেও পঞ্জাবি এপারেও পাঞ্জাবি’ বলে মাস হিপোক্র্যাসির চাষ করে স্বজাতিকে বীর্যহীন

আসিম মুনির

আত্মরক্ষায় অকৃতকার্য একটি জাতে পরিণত করেননি।

আজ বৈসারনে ইসলামিক সন্ত্রাসীদের হামলা এবং বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যার সংবাদ ভিডিয়ো সমেত প্রকাশ্যে আসায় যারা এতদিন ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকে ধামাচাপা দিয়ে রাখত তাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। ‘যারা এতদিন ধরে মানুষকে বোঝাতো’ সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না বাংলা মিডিয়ার সেই অংশকেও সোচ্চারে বলতে হচ্ছে যে সন্ত্রাসের নির্দিষ্ট জাত আছে। যারা বলেছিলেন এতদিন ধরে সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না তাদের কাছে একটি বিনম্র প্রশ্ন যে ভারত বা পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ তার আসল কারণ কী কী কারণে ভারত বারে বারে পাকিস্তান দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে? পাকিস্তান তৈরির পর কী কারণে প্রতি মুহূর্তে সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাদীরা ভারতবর্ষে এসে আক্রমণ করছে? পাকিস্তানের প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত ছাড়াও চীন, আফগানিস্তান, ইরান রয়েছে কিন্তু তারপরেও পাকিস্তান শুধুমাত্র ভারতকে কেন আক্রমণ করে?

পৃথিবীতে একটি দেশ ভেঙে দুটি দেশ বহু জায়গাতেই হয়েছে। প্রাথমিক বৈরিতা কাটিয়ে তারা আবার একসঙ্গে কাজ করতেও শুরু

হাফিজ সঈদ

সৈয়দ সালাউদ্দিন

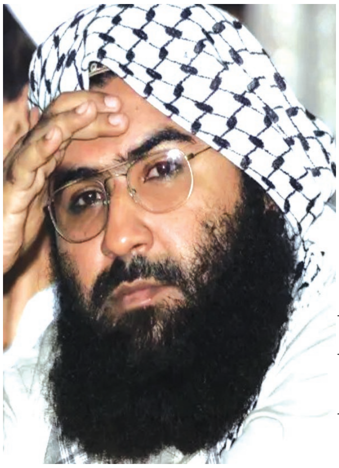

মাসুদ আজহার

করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র বৈরিতাকে পাথেয় করে পাকিস্তান কেন ভারতকেই আক্রমণ করে আমাদের দেশের সুধী নাগরিক কখনো কি ভেবে দেখেছেন? পাকিস্তান তো ইরান আক্রমণ করতে পারত, আফগানিস্তানকে আক্রমণ করতে পারত, পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে গিয়ে অন্য কোনো দেশের হয়ে পাকিস্তানি সৈনিক সেই দেশের মাটিতে অন্য দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতেই পারতো— কিন্তু পাকিস্তান তা করলেও করেছে অর্থের বিনিময়ে। জর্ডনের ভাড়াটে সেনা হিসেবে প্যালেস্তাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা লিপ্ত হয়েছে। ভারত এটা ভাবতেই শেখেনি, কারণ রবীন্দ্র-সুকান্ত-নজরুল বা রসুন সন্ধ্যার মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্বঘোষিত জ্যাঠামশাইরা সবসময় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সেই কাল্পনিক চরিত্র পাগলা মেহের আলির মতো সব ঝুট হ্যায় বোঝাতে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। সাধারণ মানুষকে তাঁরা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে চোখের সামনে ঘটে চলা জেহাদি ইসলামিক আক্রমণ আসলে একটি সাধারণ দুর্ঘটনামাত্র।

কিন্তু তাতে রোগের উপশম তো হয়নি উলটে রোগ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় শরীরের অর্ধেক অকেজো করতে চলেছিল। ভারতবাসীর ভাগ্য অনেক ভালো যে, ভারতে এখন একটি প্রখর রাষ্ট্রবাদী সরকার ক্ষমতায় আছে। ভারতবাসীর কপাল অনেক ভালো যে, সেই সরকার এই ধরনের মানসিকভাবে শয়তানি রোগগ্রস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কুষ্ঠরোগকে না ছাড়িয়ে কুষ্ঠকে সুন্দর ব্যান্ডেজের আড়ালে রেখে আরও বাড়তে দেবার প্রেসক্রিপশানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরাসরি রোগকে নির্মূল করবে বলে ঠিক করেছে।

ব্যাস্, আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গেই নির্দিষ্ট বেতন নিয়ে মুজরোখাটা বুদ্ধিজীবীর দল হই হই করে বলতে শুরু করেছেন— আহারে একি হলো। এবারে তো কাশ্মীরিয়ত, জমুরিয়ত, আমন কি আশা— এসব শব্দগুলোর আর কোনো দামই রইলো না। যেন ৭৫ বছর ধরে আমন কি আশা আর কাশ্মীরিয়ত ইত্যাদি ভারতের বহুত্ববাদে বিশ্বাসী সাধারণ হিন্দুকে কত শান্তিতে থাকতে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ভারত সরকারের অধীনস্থ সংস্থা প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর একটি রিপোর্টে চোখ বোলানো যাক :

পাকিস্তানের জঙ্গি কার্যকলাপ : কাবুল থেকে কাশ্মীর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া, জঙ্গিদের আশ্রয়দান এবং বিভিন্ন জায়গায় তা ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে পাকিস্তান যে নজির গড়েছে, তা সারা বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক। এর ফলে স্বাভাবিক স্থিতাবস্থা বিনষ্ট হয়। দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের মাটি সীমান্তের অন্য পারে সন্ত্রাসবাদকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য লঞ্চপ্যাড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চরমপন্থা ভাবধারাকে পুষ্ট করতে তাদের জুড়ি মেলা ভার।

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ২০১৮ সালে বলেছিলেন, পাকিস্তান সরকার ২০০৮ সালে মুম্বাই জঙ্গি হামলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান-ভিত্তিক ইসলামি জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা এই হামলা চালায়।

পারভেজ মুশারফ স্বীকার করেছিলেন যে, কাশ্মীরে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তার বাহিনী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। পাকিস্তান, কাশ্মীর ইস্যুকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে যেতে এবং ভারতকে আলোচনার টেবিলে বসাতে বাধ্য করতে চেয়েছিল। তাই, পাকিস্তান সরকার এই বিষয়গুলিকে জেনেও না বোঝার ভান করে থেকেছিল।

দিন কয়েক আগে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা মহম্মদ আসিফ স্বীকার করেন যে, তার দেশ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিয়ে এসেছে। এটিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিদেশ নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত এক পদক্ষেপ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিদের ছড়িয়ে দেওয়া :

আফগানিস্তান :

তালিবান ও হাক্কানি নেটওয়ার্ক গোষ্ঠীর বিভিন্ন হামলা : পাকিস্তানের গোয়েন্দা বাহিনী আইএসআই যে আফগান তালিবান এবং হাক্কানি নেটওয়ার্ক গোষ্ঠীর জঙ্গিদের আর্থিক সাহায্য করেছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং প্রয়োজনে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে এ সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য প্রমাণ মিলেছে। আফগান নাগরিক, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কাবুল ২০০৮ সালে ভারতীয় দূতাবাসে এবং ২০১১ সালে মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলা-সহ আন্তর্জাতিক বাহিনীর উপর অগণিত হামলার সঙ্গে এই গোষ্ঠীগুলি যুক্ত ছিল। বিশিষ্ট সাংবাদিক শার্লট গল তাঁর বইতে লিখেছেন, 'আইএসআই এজেন্টদের গুন্ডা বাহিনীর সদস্যরা নিজে থেকেই দূতাবাসে বোমা হামলা চালায়। পাকিস্তানি গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এই হামলার প্রস্তাবে সায় দেয় এবং পুরো প্রক্রিয়াটিতে নজরদারি চালায়'।

রাশিয়া :

২০২৪ সালে মস্কোয় কনসার্ট হলে হামলা : ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে মস্কোয় জঙ্গি হামলার তদন্তের সময় পাকিস্তানের যুক্ত থাকার বিষয়টি সকলের সামনে আসে। রুশ কর্তৃপক্ষ এই হামলার মূল চক্রী হিসেবে একজন তাজিক নাগরিককে শনাক্ত করে। তদন্তের সময় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, হামলাকারীদের পাক যোগের বিষয়টি উঠে আসে। হামলাকারীরা সম্ভবত পাকিস্তানি নেটওয়ার্ক থেকে বিভিন্ন সরঞ্জাম পেয়েছে। তাদের আদর্শগত দিক থেকেও নানাভাবে সহায়তা করা হয়েছে।

ইরান :

জইশ উল-আদল গোষ্ঠীর হামলা : পাকিস্তান-ভিত্তিক সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠী জইশ উল-আদল সিস্তান এবং বালুচিস্তান প্রদেশে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা চালায়। জবাবে, ইরান ২০২৪ সালের ১৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের সাহায্যে একটি অভিযান চালায়। ইরান জানিয়েছে, তারা জইশ উল-আদল গোষ্ঠীর বিভিন্ন ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে এই অভিযান চালিয়েছে।

সীমান্তের অপর প্রান্ত থেকে জঙ্গিদের মদত দেওয়া : ইরান প্রতিনিয়ত অভিযোগ করে, সুন্নি জঙ্গিরা সীমান্তের অপর প্রান্ত থেকে এসে তাদের দেশে হামলা চালায়। পাকিস্তান এদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ তো নেয়ই না, বরং সহায়তা করে।

ব্রিটেন :

লন্ডনে ২০০৫ সালে বোমা হামলা : লন্ডনে ২০০৫ সালের ৭ জুলাই ৪ জন ব্রিটিশ ইসলামি জঙ্গি যে বোমা হামলা চালায়, তারা পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এদের মধ্যে ৩ জন— মহম্মদ সিদ্দিক খান, শেহজাদ তনভীর এবং জার্মেইন লিন্ডসে ২০০৩-০৫ সালে পাকিস্তানে ছিল।

পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে ওসামা বিন

লাদেনের মুক্তাঞ্চল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১১ সালে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে এক অভিযানের মাধ্যমে আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে সন্ত্রাবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিটি কতটা অসার, তা স্পষ্ট হয়। পাকিস্তানের মিলিটারি অ্যাকাডেমির কাছে একটি বাড়িতে বিন লাদেন বছরের পর বছর বসবাস করেছে, অথচ কেউ জানতেও পারেননি। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, এতে আইএসআই-ও যুক্ত ছিল।

জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-র কার্যকলাপ জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-কে আর্থিক সাহায্য করা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে পাকিস্তানের আইএসআই যুক্ত বলে অভিযোগ করা হয়। নিষিদ্ধ এই ইসলামিক সংগঠন ২০১৬ সালে ঢাকায় গুলশন এলাকায় হোলি আর্টিজান ক্যাফেতে হামলার ঘটনায় জড়িত ছিল (২০ জন পণবন্দি এই ঘটনায় প্রাণ হারান)। পাকিস্তানি কূটনীতিবিদরা ২০১৫ সালে জেএমবি গোষ্ঠীর সদস্যদের যখন আর্থিক সাহায্য করছিল, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তখন তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং ওই কূটনীতিবিদদের সেদেশ থেকে বহিষ্কার করে।

বাংলাদেশের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা মুসলমান শরণার্থীদের শিবিরে ৪০ জন উদ্বাস্তুকে জেএমবি-র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় আইএলআই যুক্ত বলে ২০২০ সালে একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে জানানো হয়। এদের ভারতে অনুপ্রবেশ করানোই উদ্দেশ্য ছিল। পারস্য উপসাগরীয় কিছু দেশে সক্রিয় বেসরকারি সংগঠনগুলি জেএমবি-কে আর্থিক সাহায্য করে থাকে। পাকিস্তানি মদতদাতারা এদের বাংলাদেশ ও ভারতে ছড়িয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার মতো রাজ্যে এই বাহিনীর স্লিপার সেল রয়েছে। আঞ্চলিক স্তরে পাকিস্তানের বিপক্ষ শক্তিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে ছায়াযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করার উদ্দেশ্যে পাক গুপ্তচর সংস্থার এই গোষ্ঠীর সঙ্গে আতাত করেছে।

পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

যদিও পাকিস্তান দাবি করে যে, জঙ্গিদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য সত্যের অপলাপ। দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিদের মদত দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের সামরিক ও গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক সক্রিয়। পাক সৈন্যরা জেহাদিদের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করে থাকে।

পাকিস্তানের পঞ্জাব, খাইবার পাখতুনখোয়া (পূর্বতন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), ওয়াজিরিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মতো বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে। লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি), জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম), হিজবুল মুজাহিদিনের মতো গোষ্ঠী এই প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি পরিচালনা করে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএস (ইসলামিক স্টেট)— খোরাসনের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এখানে চরমপন্থার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে, সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে এবং আত্মঘাতি হামলার প্রস্তুতির জন্য নানাভাবে সহায়তা করে থাকে।

জঙ্গি হামলাগুলি যাতে সাধারণ মানুষের প্রাণহানিকে নিশ্চিত করে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে পাক সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরা এইসব শিবিরগুলিতে নিয়মিত আসে।

মার্কিন বিদেশ দপ্তর থেকে ২০১৯ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে পাকিস্তানকে 'আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 'পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও জঙ্গিবাদ : এক অশুভ আঁতাত'— শীর্ষক এক প্রতিবেদনে ইউরোপিয়ান ফাউন্ডেশন ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক প্রতিষ্ঠান, পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবং চরমপন্থী ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগর বিষয়টি তুলে ধরেছে।

পাকিস্তানের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'হাম নিউজ'— এ ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় স্তরে একটি সাক্ষাৎকরে ব্রিগেডিয়ার ইজাজ আহমেদ শাহের ভয়াবহ এক স্বীকারোক্তি সম্প্রচারিত হয়। সাংবাদিক নাদিম মালিকের একটি 'টক শো'তে তিনি স্বীকার করেন যে, জঙ্গি সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়া (জেইউডি)-কে সমাজের মূলস্রোতে যুক্ত করার জন্য পাকিস্তান কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে। পারভেজ মুশারফ একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাশ্মীরিদের মুজাহিদিন হয়ে উঠতে 'পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়'। তিনি আরও জানান, পাকিস্তানে জেহাদি জঙ্গিদের 'হিরো'র সম্মান করা হয়। এমনকী, আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত জঙ্গি ওসামা বিন লাদেন, আয়মান আল-জাওয়াহিরি এবং জালালুদ্দিন হাক্কানিকেও 'হিরো'র মর্যাদা দেওয়া হয়। জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার ক্ষেত্রে পাক মদতের ব্যাপারটিও স্বীকার করেন তিনি।

রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার যে 'পাকিস্তান' নামক মুখোশের আড়ালে যে ইসলামিক ফ্যাসিস্ট আরব সাম্রাজ্যবাদ ভারতের ভিতরে ও বাইরে সনাতন ভারতের বহুত্ববাদী দর্শনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, তা সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে— বিগত ২২ এপ্রিল, ২০২৫ বেছে বেছে নিরস্ত্র হিন্দুনিধনের পর ঈশ্বর সেই রণদুন্দুভি বাজিয়ে দিয়েছেন। সারা পৃথিবী এখন সমবেতভাবে সন্ত্রাসবাদের নির্দিষ্ট 'ধর্ম'কে চিহ্নিত করতে পারছে— তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে শামিল হচ্ছে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের দ্বারা সৃষ্ট 'পাকিস্তান' কোনো দেশ নয়, একটা মানসিকতা, মানসিক ব্যাধি— মুর্শিদাবাদ থেকে থেকে পহেলগাঁও, কেরালা থেকে অসম, বালুচিস্তান থেকে ঢাকা, হায়দরাবাদ থেকে হাওড়া, কলকাতা থেকে করাচি— সর্বত্র এই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত জঙ্গি গিজগিজ করছে। হিন্দুদের বাঁচতে হলে এই মানসিক ব্যাধির কারণটিকে নির্মূল করতে হবে।

এই যুদ্ধ সারা পৃথিবীতে ইতি উতি চলতে থাকা 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন'কে এক অন্তিম ও নির্ণায়ক দিশা দেবে। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ও তার প্রযোজক, পরিচালক ও সমর্থকবৃন্দ কালের অতলে মিলিয়ে যাবে। ওরা ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু দখলের মাধ্যমে ভারতাত্মাকে আঘাত করতে শুরু করেছিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুতীরে ভারতে প্রত্যাঘাত ওদের বহুত্ববাদ ও মানবতাবিরোধী মত, যা পাকিস্তান নামক সাইনবোর্ডের পেছনে থেকে সারা পৃথিবীতে অসুরবাদের প্রসার ঘটাচ্ছে, তা মূল থেকে শেষ করবে— করবেই করবে। আর সেইজন্যই ভারত শুরু করেছে অপারেশন সিঁদুর। □

মোদী-বেগিন যেন এক ছাঁচে গড়া রাষ্ট্রনেতা

দুর্গাপদ ঘোষ

সবুরে মেওয়া ফলে। ফলেওছে। ৪৪ বছর আগে কিছুটা সবুরে মেওয়া ফলেছিল ভারতের মতোই অন্য দেশ ইজরায়েলের। সাল ও মাস ভিন্ন হলেও ঘটনাচক্রে তারিখটা একই, ৭। দিনের পর দিন ইসলামি জঙ্গি হামলা, প্রতিবেশী দেশগুলোর আস্ফালন ও হুমকি সহ্যের পর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙা প্রত্যাঘাত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরমাণু বোমার হুমকির মুখের মতো জবাব। ফারাক এটাই, সেদিন ইজরায়েলের পাশে আমেরিকা ও ভারত ছাড়া বস্তুত আর কেউ ছিল না। আজ ভারতের পাশে প্রায় সমস্ত দেশ রয়েছে। ইজরায়েলের চারিপাশে ইসলামি শত্রুদেশ। ভারতের চারিপাশে সবগুলো ইসলামিক দেশ না হলেও বেশিরভাগই বন্ধুদেশ নয়। তবে ওই ইহুদি দেশের সঙ্গে ভারতের একটা খুব বড়ো পার্থক্য হলো ওদের দেশে, নিজেদের ঘরের মধ্যে 'ঘরশত্রু' ছিল না। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বাইরের শত্রু যত বিপজ্জনক, তার চাইতে অনেক বেশি বিপজ্জনক হলো ঘরশত্রু–– পঞ্চম বাহিনী। বেসরকারি এক সমীক্ষায় অনুমান করা হয়েছে, ভারতের মধ্যে পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ছাড়াও প্রায় দু'কোটির মতো দেশদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতিতে দুই দেশের দুই প্রধানমন্ত্রী যেন এক ধাতুতে গড়া। দু'জনেরই দেশপ্রেম, দায়বদ্ধতা, ধৈর্য, সাহস এবং স্থির সিদ্ধান্ত যেন একই রকম ইস্পাত কঠিন। প্রত্যাঘাতের মাত্রায় 'অপারেশন সিঁদুর' 'অপারেশন ওসিরাক'-এর চাইতে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু এই মুহূর্তে মিলটাও কিছু কম-বেশি নয়। সেদিন ইজরায়েল জুড়ে যেমন উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, এবার তেমনই পরিবেশ তৈরি হয়েছে গোটা ভারতে। সেদিন ইজরায়েল জুড়ে ধ্বনি উঠেছিল 'মেনাখেম বেগিন দীর্ঘজীবী হোন'। আজ ভারত জুড়ে ধ্বনিত হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ।

নরেন্দ্র মোদী

মেনাখেম বেগিন

১৯৮১ সালের ৭ জুন। বিকেল ৪টায় মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন ইজরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিন। ৪টে বেজে ৫ মিনিটে বৈঠক কক্ষে ঢুকে কোনোরকম ভণিতা না করে যেন একটা বোমা ফাটিয়ে দিলেন। জানালেন, এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টা আগে ৩ খানা এফ-১৫ এবং ২ খানা এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ইরাকের ওসিরাক পরমাণুকেন্দ্র ধ্বংস করে দেবার জন্য তেলআবিব থেকে রওনা হয়ে গেছে। আশা করছি অভিযান সফল করে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরে আসবে। বৈঠক কক্ষে তখন একটা সূচ পড়লেও শোনা যাবার মতো অবস্থা। তার আগে পর্যন্ত বেগিন মন্ত্রীসভার কোনো মন্ত্রীও ওই অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। কল্পনাও করতে পারেনি সাদ্দাম হোসেনের ইরাক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে তিনি কখন কী সিদ্ধান্ত নেবেন বা তাঁর ডান হাত কখন কী করবে তা তাঁর বাঁ হাতও জানতে পারে না। বড়ো কোনো কিছু করার আগে তিনি সবার সঙ্গে কথা বলেন, আলোচনা করেন। অসীম স্থৈর্যে সবার কথা শোনেন, পরামর্শ নেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি একমেবদ্বিতীয়ম্। ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করার সময়ও তা দেখা গেছে। এবার ৭ মে-তেও দেখা গেল। ঝড়ের আগে একটা যে গুমোট, থমথমে ভাব দেখা যায়, মোদীর চালচলনে সে আভাসটুকুও পাওয়া যায়নি। গত ৭ মে রাত দুপুরে পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদুরের মতো এতবড়ো একটা প্রত্যাঘাতের কয়েক ঘণ্টা আগেও তাঁর চলন-বলন ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বেগিনও ছিলেন একই জাতের রাষ্ট্রনেতা। একই রকমের সুকৌশলী প্রধানমন্ত্রী। সন্ত্রাসবাদ এবং দেশের বিরুদ্ধে হুমকি-আস্ফালনের প্রতি শূন্যসহ্যের নেতা।

১৯৮১ সালের ৭ জুন বিকেলে এক অদ্ভুত কৌশলে ইরাকের পরমাণু কেন্দ্র উড়িয়ে দেয় ইজরায়েল। কারণ তার প্রায় আড়াই মাস আগে ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেন প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র নেতা ইয়াসের আরাফতকে সমর্থন করে দরকার হলে ইজরায়েলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন। তার আগে জঙ্গিসংস্থা পিএলএ প্যালেস্টাইন ও লেবাননে ঘাঁটি করে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছিল। বার বার সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে হত্যা করে যাচ্ছিল ইজরায়েলিদের। ১৯৭৮ সালে জার্মানির মিউনিখ অলিম্পিক ভিলেজে ঢুকে ইসলামি সন্ত্রাসীরা বেছে বেছে ৮ জন ইজরায়েলি ক্রীড়াবিদকে হত্যা করে। সে ঘটনা সারা বিশ্বের ক্রীড়াজগতে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছে। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসের শেষে আরাফতের জঙ্গিরা লেবানন ও জর্ডনে ঘাঁটি করে জেরুজালেমে অবস্থিত আল আকসা মসজিদ দখল করার নামে তিন-তিনবার ইজারায়েলের ওপরে জঙ্গি হামলা চালায়। এর কয়েক দিনের পরেই লেবাননের মধ্যে মজহব জিজ্ঞাসা করে ১১ জন ইজরায়েলি ইহুদিকে বেছে বেছে তুলে নিয়ে গিয়ে গলায় দড়ি পরিয়ে ঝুলিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কেবল তাই নয়, তার ভিডিয়ো করে নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তখন ইজরায়েল লেবাননের ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভিতরে ঢুকে আরাফতের জঙ্গিদের বেশ কয়েকজনকে নিকেশ করলে ইরাকের নেতা সাদ্দাম হোসেন ইজরায়েলকে শেষ করে দেবার হুমকি দেন। সেজন্য সন্ত্রাসবাদী পিএলএ-কে ইরাকের স্কাড মিসাইল দেবার কথাও ঘোষণা করেন।

ইতিমধ্যে ইজরায়েলের বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা বাহিনী 'মোসাদ' জানতে পারে যে ইরাক তাদের রাজধানী বাগদাদ থেকে ১৭ কিলোমিটার

দক্ষিণ-পূর্বে ওসিরাক-এ মাটির তলায় ১২ ফুট নীচে দুর্ভেদ্য বাঙ্কার বানিয়েছে। পরমাণুকেন্দ্রের নামে তলে তলে পরমাণু বোমা তৈরি করছে। সফল হলে তা দিয়ে ইজরায়েলকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে দেবার মতলবে রয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে লৌহপুরুষ বেগিন বিশ্বকে জানিয়ে দেন যে ইজরায়েলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা অবিলম্বে ওসিরাক পরমাণুকেন্দ্র ধ্বংস করে ইরাকের আস্ফালনের মুখের মতো জবাব দেবে। বেগিন এই হুমকি দিয়েছিলেন ১৯৮১ সালের ২৪ মার্চ। এতে পিএলএ আরও উগ্র হয়ে ওঠে এবং বার বার লেবানন ও প্যালেস্টাইনের দিক থেকে হামলা করে হত্যালীলা চালিয়ে যেতে থাকে।

বেগিনের প্রতিশ্রুতির ওপর ইজরায়েলবাসীর পূর্ণ আস্থা ছিল। এখন যেমন নরেন্দ্র মোদীর ওপরে আস্থা রয়েছে আপামর ভারতবাসীর। ভারতবাসী যেমন বিশ্বাস করেন 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'— মোদী থাকলে সবকিছু সম্ভব, তেমনি সে সময় বেগিনের প্রতিও গভীর আস্থা ছিল ইজরায়েলিদের। কিন্তু এক-একটা করে দিন চলে যেতে থাকায় বেগিনের ওপর আস্থা হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়তে থাকেন ইজরায়েলিরা। ক্রমে একটা সময় আসে যখন ইজরায়েলিদের একাংশ বেগিনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশও করতে শুরু করেন। এমনকী অনেকে হাল ছেড়ে দিয়ে প্রকাশ্যেই বলতে থাকেন এই বেগিন-টেগিনকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। এর চাইতে প্রাক্তন মহিলা প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার অনেক বেশি শক্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দিনের পর দিন কেটে যেতে থাকে, বেগিন কারও কথায় কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছিলেন না। ফলে সকলেই ধরে নিয়েছিলেন ইজরায়েল সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মদতদাতাদের কাছ থেকে কিল খেয়ে কিল হজম করে ফেলেছেন। কিন্তু ঘটনা হলো, বেগিন মোটেই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিলেন না। হিমালয়ের মতো ধৈর্যে অটল থেকে ইরাকের ওসিরাক পরমাণুকেন্দ্র ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর সেনাবাহিনীকে দিয়ে গোপনে মহড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন নির্জন সিনাই মরুভূমির মধ্যে। এফ-১৫ এবং এফ-১৬ যুদ্ধবিমান সেখানে তিন-তিন বার সফল মহড়া দিলেও রাডারের ইন্টারসেপশন থেকে নিজেদের আড়াল করতে পারছিল না। সেজন্য মহড়ায় কার্যকরী হতে একটু বেশি সময় নিতে হচ্ছিল। তারপর যখন তিনি এবং তাঁর সেনাবাহিনী ও মোসাদ সফল মহড়া সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন, তখন ঠিক হলো আসল কাজটা অর্থাৎ বোমাবর্ষণ করবে এফ-১৬, আর তাদের ২ খানা বিমানকে দুপাশ এবং পিছনে থেকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে ৩ খানা এফ-১৫ যুদ্ধ বিমান। তারা এমনভাবে যাবে যাতে সবার মনে হয় কোনো একখানা যাত্রীবাহী বড়ো বিমান দিশা হারিয়ে ইরাক বা ইরানের দিকে যাচ্ছে। নিয়ম অনুসারে কারগো বা মালবাহী এবং যাত্রীবাহী বিমানকে গুলি করে নামানোর নীতি ও রীতি নেই। সেজন্য সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। সেটা কিছুটা সময়েরও ব্যাপার। এই সুযোগটাই প্রায় দু'মাস ধরে তৈরি করছিলেন বেগিন।

কাজটা নিতান্ত সহজ ছিল না। কারণ, তেলআবিব থেকে অন্তত দুটো দেশ জর্ডন ও লেবাননের আকাশসীমা পার হয়ে তবে ইরাকের আকাশসীমায় পৌঁছতে হয়েছিল ইজরায়েলের ওই ৫ খানা যুদ্ধ বিমানকে। কিন্তু তিন-তিনটে দেশের রাডারকে ক্যামোফ্লেজ (বিভ্রান্ত) করে ৫৫০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে সফল অপারেশন করে ফিরে আসে ইজরায়েল। এফ-১৬ থেকে অন্যান্য বোমা ছাড়াও দু'টো ক্লাস্টার বোমা ছোঁড়া হয়, যা ওসিরাক পরমাণুকেন্দ্রের মজবুত বাঙ্কার ফুটো ভেদ করে পরমাণু কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধ্বংস করে দেয় ইরাকের পরমাণুবোমা বানিয়ে ইজরায়েলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার স্বপ্ন।

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীর উপত্যাকার পহেলগাঁওয়ে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে, এমনকী পুরুষ পর্যটকদের প্যান্ট খুলে পরীক্ষা করে বেছে বেছে ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে এলোপাথাড়ি গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবার পর থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে হামলাকারীদের তাদের কল্পনার বাইরে শাস্তি দেবে ভারত। অনেকে, এমনকী সংবাদ মাধ্যমগুলো ধরে নিয়েছিল খুব বেশিদিন হলে ১০-১২ দিনের মধ্যে মোদীর ভারত ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মতো হামলা করবে। কিন্তু তা না করে ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করা, চেনাব নদীর জল আটকানো, চেনাব নদীর জল আটকে হঠাৎ করে অতিরিক্ত মাত্রায় জল ছেড়ে বন্যা পরিস্থিতি ঘটানো, বিদ্যুৎ বন্ধের হুমকি, বাণিজ্যচুক্তি রদ ইত্যাদি করে সময় কাটাতে থাকেন নরেন্দ্র মোদী। এদিকে পাকিস্তানের ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত না করায় ভারতীয়দের একাংশের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে শুরু করেছিল। কেউ কেউ হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। ১৪ দিনের মাথায় কেউ কেউ উষ্মা প্রকাশ করতেও ছাড়েননি। কখনো কানাঘুঁষো শুরু হয়েছিল,মোদী 'আসলে নখদন্তহীন কাগুজে বাঘ' (A toothless paper tiger)। কিন্তু আসল বাঘ যে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় চুপটি করে ঘাঁপটি মেরে থাকে এটা অনেকে এমনকী অনেক পাকা নেতাও অনুমান করতে পারেননি। সেই বাঘ যখন রাত ১.৫ মিনিটে কেবল পাক অধিকৃত কাশ্মীরেরই নয়, একেবারে পাকিস্তানের ভেতরেও ২৪টা মিসাইলের আঘাতে ৯ জায়গায় প্রায় ১৪ টার বেশি লস্কর, হিজবুল এবং জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটি উড়িয়ে দেয়। তখন সীমান্ত বরাবর মজুত রাখা পাক যুদ্ধবিমানগুলোর কোনো কিছুই করার ছিল না। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো যা রাফারেল এবং সুখোই-৩০ বিমান থেকে ফায়ার করা হয়েছিল, পাকিস্তানি রাডার একটাকেও ইন্টারসেপ্ট করতে পারেনি। মাসুদ আজহারের পরিবারের ১৪ জন নিকেশ হয়েছে। সে নিজেও সেদিন প্রাণে মারা যেত বলে নিজেই জানিয়েছে। কংগ্রেসের এক নেতা অজয় রায় রাফারেল বিমানকে খেলনা বাড়িয়ে তার গলায় লেবু-লঙ্কা ঝুলিয়ে যেভাবে পঞ্চম বাহিনীর মতো ব্যবহার করেছেন, তিনি যেন এবার রাফারেলের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হন।

অতপর ভারতের এই জবাব কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা সময় বলবে। কিন্তু এই নিবন্ধে বিশ্বের দুই দৃঢ়চেতা নেতার এবং তাঁদের রণকৌশলের কিছুটা সাজুয্যের কথা তুলে ধরা গেল। এবার পাকিস্তানের শুধু খান-খান হওয়া বাকি। আর বাকি পাকিস্তানের জবরদখলীকৃত কাশ্মীর ফের ভারতভুক্ত করে অখণ্ড কাশ্মীর বাস্তবায়িত করা। ইতিমধ্যে বালুচিস্তান, খাইবার পাখতুনখাওয়া, সিন্ধুপ্রদেশ এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর সর্বত্রই পাকিস্তানের খপ্পর থেকে মুক্ত হবার জন্য বিদ্রোহ, কোথাও কোথাও সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে বোধহয় 'নির্বাক সৈনিক' নরেন্দ্র মোদীর মনে কী আছে তা অনেকেই অনুমান করতে পারছেন। কিন্তু তার জন্য তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি অটল আস্থা রাখা এবং সেজন্য সমস্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়াটাই এখন সবচাইতে বেশি জরুরি। □

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং ভারতের যোগ্য জবাব

অজয় ভট্টাচার্য

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি আক্রমণে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল কাশ্মীরের। কাশ্মীরের জনগণের। ওই রাজ্যের গরিব মানুষের। পাকিস্তান চাইছে ভারতের এই অঙ্গরাজ্যটি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মতো ভিখিরি হয়ে যাক। কাশ্মীরি জনগণ সেটা বুঝতে পেরেছে। তাই তাঁরা ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। মিছিলে স্লোগান উঠেছিল, 'আমি ভারতীয়, হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ'। মসজিদগুলি থেকে লাউডস্পিকারে তাঁদের হাতে না মেরে ভাতে মারার কৌশল নিয়েছে। পর্যটন শিল্পের উপর একটা বিরাট আঘাত হেনেছে। তাই প্রতিবাদে

পাছে অনিষ্ট করে। তাই অপারেশন সিঁদুরের প্রয়োজন ছিল। ভারত কখনো কোনো দেশকে আক্রমণ করেনি। তবে আত্মরক্ষার্থে তাকে যুদ্ধের পথে যেতে হয়েছে। সার্জিকাল স্ট্রাইক বিনাযুদ্ধে আত্মরক্ষার এক বিশেষ কৌশল। পহেলগাঁওয়ে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রত্যাঘাত যে যথেষ্ট পরিণত ও সুপরিকল্পিত তা প্রমাণিত হয় এই অপারেশনের নামকরণের মধ্য দিয়ে। পহেলগাঁওয়ে হামলায় যে সমস্ত নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে জঙ্গিরা সেই নারীদের প্রতি সম্মান জানাতে অপারেশনের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর'। ভারতীয় সেনার মূল লক্ষ্য হলো পাকিস্তানের এবং পাক

শামিল হয়েছিল কাশ্মীরের সংবাদপত্রগুলিও। ঘটনার পরের দিন প্রথম পাতা ব্ল্যাক রেখে নিহতদের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করেছিল কাশ্মীরের প্রথমসারির দৈনিকগুলি। সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা অক্ষরে। কোনো কোনো সংবাদপত্রে হত্যার খবর ছাপা হয়েছিল লাল কালিতে।

নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁদের পরিবার পরিজনের আর্তনাদ, কাশ্মীরি জনগণের প্রতিবাদ বুঝিয়ে দিতে সংবাদপত্রগুলির এই ভূমিকা যে যথেষ্ট ইতিবাচক তা বলাই বাহুল্য। কাশ্মীরের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ায় হত্যার দায় নেওয়া 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফোর্স' প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে। তবে এই আক্রমণের চরিত্র সম্পূর্ণ নতুন। ধর্মীয় সংঘাত বাঁধিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত স্পষ্ট। যেখানে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ধরে রাখতে পাকিস্তান নাজেহাল, সেখানে ভারতের এই অঙ্গরাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টির অর্থ যে সুগভীর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পাক অধিকৃত কাশ্মীরি জনগণ পাকিস্তানে অবহেলিত। অর্থনৈতিকভাবে তাঁরা বেশ পিছিয়ে। অথচ কাশ্মীরের এই অংশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটেপুটে নিচ্ছে পাকিস্তান। যে অভিযোগ পাক অধিকৃত কাশ্মীরি জনগণের দীর্ঘদিনের। সুতরাং মজহব এক হওয়া মানেই সমস্যারসমাধান নয়।

এমনিতেই পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকা পাহাড় ও জঙ্গল পরিবেষ্টিত। তাই হামলা চালিয়ে গা ঢাকা দেওয়া সহজ। অন্য জেলায় ঢুকে পড়াও সহজ। জায়গাটির সঙ্গে শহরের মূল অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো নয়। নিরাপত্তা বাহিনী আসার আগেই ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে চম্পট দেওয়া সহজ। সম্ভবত এত সব সুবিধা থাকার জন্যে জঙ্গিরা হামলার জন্যে বৈসরন উপত্যকাকে বেছে নিয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ার জন্যে বেশ কয়েকজন আহত পর্যটককে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অত্যধিক রক্তপাত হওয়ার জন্য তাঁদের মৃত্যু হয়। মৃত্যু হয় একজন কাশ্মীরি ঘোড়াওয়ালার, যে আততায়ীদের কাজে বাধা দিয়েছিল। আততায়ীর বন্দুক কেড়ে নিতে গিয়েছিল। জঙ্গিদের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে ভারতের ঐক্য নষ্ট করা এবং ভারতকে অর্থনৈতিক ভাবে পর্যুদস্ত করা।

তাই পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রত্যুত্তরে মদতদাতা পাকিস্তানকে একটি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। নিদেনপক্ষে জঙ্গিঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দিয়ে একটা বার্তা দেওয়ার দরকার ছিল। কথামৃতের গল্প অনুযায়ী বলতে হয়, 'দুষ্টু লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, তাদের ভয় দেখাতে হয়, অধিকৃত জঙ্গিঘাঁটিগুলি। কিন্তু তার জন্যে পাকিস্তানের সীমা লঙ্ঘন করার প্রয়োজন হয়নি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে পাকিস্তানের সীমার বাইরে থেকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে আক্রমণ হেনেছে ভারতীয় সেনা।

এবারের প্রত্যাঘাত পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডকে স্পর্শ করেছে। তাই এই প্রত্যাঘাত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। প্রত্যাঘাতের জন্যে পাকিস্তানের ভূখণ্ডকেও ছাড় না দিয়ে ভারত প্রমাণ করল, জঙ্গি দমনের জন্যে ভারতীয় সেনা যে কোনো পরিস্থিতির জন্যে তৈরি। এর জবাবে পাকিস্তান যদি ভারতের জনজীবনে আক্রমণ হানে, যার সম্ভবনা প্রবল, তবে পরিস্থিতি সরাসরি যুদ্ধের দিকেও গড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে দায়ী থাকবে পাকিস্তান। অপারেশন সিঁদুর প্রমাণ করে দিয়েছে যে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের আঁতুড়ঘর। জঙ্গি তৈরির কারখানা। সন্ত্রাসবাদী তৈরির জন্যে সেখানে রীতিমতো ট্রেনিং ক্যাম্প গড়ে উঠেছে। তবে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। একদিন এই সন্ত্রাসবাদীদের হাতেই শেষ হবে পাকিস্তান। সেদিন আর খুব বেশি দূরে নেই। তার দেওয়াল লিখন এখনই ফুটে উঠেছে।

গরমে ত্বকের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে বেশি করে জল পান করুন

ডাঃ ইমরান ওয়ালি

গরম মানেই প্যাচপেচে ঘাম। আর আমাদের ত্বকের দফারফা। ঘাম গায়ে বসে, সেখানে নয় চুলকানি, হয়ত-বা অন্য কোনো রকম ফাঙ্গাল ইনফেকশন থেকে ত্বক হয় মারাত্মক রকম ক্ষতিগ্রস্ত। এই গরমকালটা আমাদের কাছে খুবই অস্বস্তির। ঘাম আর ফাঙ্গাল সংক্রমণ নিয়ে জেরবার সবাই। বিশেষ করে ঘামাচি, দাদ, অ্যালার্জি আর তাঁর সঙ্গে চুলকানিতে সে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

প্রথমেই আসি ঘামাচির বিষয়ে। এই পিছনে রয়েছে ত্বকের ঠান্ডা গরম হওয়া। আমাদের ত্বকের মধ্যে থাকা ঘাম বাইরে আনার জন্য যে গ্রন্থিগুলো থাকে তার মুখ বড়ো হয়ে যায়। সেটার কোনো রকম বাধা বা অস্বাভাবিকতা থাকলে আমাদের ঘামাচি দেখা দেয়। আমরা এক্ষেত্রে ঘামাচির জন্য অনেক লোশন আছে, সেগুলি ব্যবহার করতে বলি। কোনো মলম নয় কিন্তু। এখানে কিন্তু খাবারের একটা ভূমিকার কথা বলব, এই ঘামাচি এড়াতে হালকা খাবার লেবু জল, একটু নুন মিশিয়ে নিতে হবে। আর অবশ্যই বেশি জল পাওয়া যাবে এরকম তরকারি। শশা খাবার চেষ্টা করবেন। মাছের ঝোল ঝিঙ্গে, জিরেবাটা দিয়ে খেলে ত্বক ঠাণ্ডা থাকে। প্রতিদিন খাবারের মেনুতে শুক্তো রাখুন। এই শুক্তোই আপনার ত্বককে তরতাজা ও ভালো রাখতে সাহায্য করবে। কেননা শুক্তো হচ্ছে সেদ্ধ করা একটা তরকারি।

এবার আসি দাদের কথায়। এর কারণ ঠিক মতো স্নান না করা, ঘামে ভেজা কাপড়ে থাকা, গামছা অপরিষ্কার থাকা। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ত্বককে যত পরিষ্কার রাখবেন, দাদ তত হবে না। দাদ কিন্তু খুব ছোঁয়াচে। আর দাদ হবার জায়গা হচ্ছে আমাদের শরীরের নরম জায়গাগুলি। পরিষ্কার টাওয়েল, আন্ডার গারমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। এর চিকিৎসা হচ্ছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ইনফেকশনের চিকিৎসা ও ওরাল অ্যান্টি ফাঙ্গাল ইনফেকশনের চিকিৎসা। মনে রাখবেন, এই দাদের চিকিৎসা কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদি। ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করে যেতে হবে। সেরে গেছে ভেবে চিকিৎসা বন্ধ করে দিলে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই সময়ে খেয়াল রাখতে হবে, খাবার থেকে অ্যালার্জি হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তাই খাবার খাওয়ার বিষয়ে একটু সজাগ থাকতে হবে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চললে নিস্তার পাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রাস্তার কাটা ফল নৈব নৈব চ। যত তৈলাক্ত জিনিস কম খাবেন তত আপনার ত্বক ভালো থাকবে।

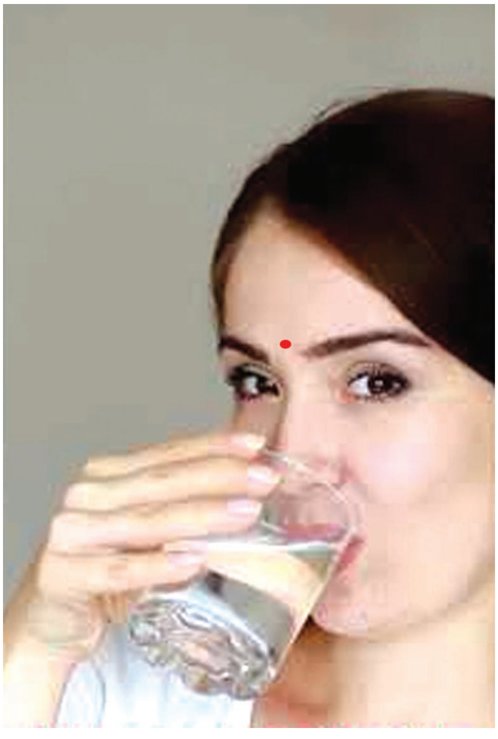

কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। অথচ সারাক্ষণ একটা কোনো না কোনো অস্বস্তি আমাদের পিছনে তাড়া করছে। এই কথার শুরুতেই, আমি কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করব। প্রথম, আমি প্রত্যেককে বলব, প্রতিদিন একটু হলেও ব্যায়াম বা এই ধরনের কিছু করতে হবে। কেন বলি, আমাদের শরীরে ঘাম না এলে ত্বক তাঁর আপন ছন্দ হারিয়ে ফেলে। সে নিজে থেকেই নিজেকে ক্ষতি করতে শুরু করে। দুই, ভাজাভুজি খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন, আর প্রতিদিন একটা করে মরশুমি ফল খান। তিন, শরীরকে বিশেষ করে আপনার ত্বককে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন। পারলে দুই থেকে তিনবার স্নান করুন।

পোশাকের বিষয়কে হেলাফেলা করা চলবে না। হালকা রঙের সুতির পোশাক পরার চেষ্টা করুন, একটু ঢিলে ঢালা পোশাক পরুন। গায়ের সঙ্গে একেবারে সেঁটে থাকা বা টাইট জামাকাপড় একটু এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করুন।

বাইরে বেরোবার ক্ষেত্রে, শরীরের খোলা জায়গায়, যেখানে

ফঃ৩

সূর্যের আলো লাগতে পারে, সেই জায়গায় বেরোবার আধ ঘণ্টা আগে সানস্ক্রিন লোশন লাগিয়ে বেরবেন, আর ফিরে এসে দিনের শেষে মুখটাকে ভালো করে ধুয়ে ফেলবেন। যদি মনে করেন ভালো ফেস ওয়াশ ব্যবহার করতে পারেন। আর গরমে বাইরে বেরলে অবশ্যই ছাতা নিন।

নানা কারণে আমাদের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেটা দূষণ থেকে হতে পারে বা খাবার থেকেও হতে পারে। মনে রাখবেন, ত্বকের অকাল বার্ধক্য আসে কিন্তু খাবার থেকেই। আমাদের খাবারের অভ্যাস, বর্তমানে জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা অনেকেই জাঙ্ক ফুডের ওপর বেশি করে নির্ভর হয়ে পড়েছি। এই জাঙ্ক ফুড কিন্তু আমাদের শরীরের ভিতরে নানা ক্ষতি করছে। তাঁর প্রভাব পড়ছে ত্বকের ওপর। লিভার, কিডনি বা হজম সংক্রান্ত নানা কারণের অস্বাভাবিক বিষয় সবচেয়ে আগে ক্ষতি করতে শুরু করছে আমাদের ত্বককে। আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, আপনার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুড হ্যাবিট পরিবর্তন করতেই হবে। তবেই দেখবেন আপনার ত্বকের অকাল বার্ধক্য আসবে না। কম বয়সে আপনার শরীর অনেক অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু একটু বেশি বয়স হলে সেই ক্ষমতাটাই চলে যায়। তাই বলব বয়স বাড়লে সাবধান।

অন্য একটা বিষয় নিয়ে বলি। এখন দেখবেন আমাদের একটা প্রবণতা হয়েছে নিজের মতো করে অনেক কিছু ঠিক করে নিই। যেমন মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক কিছু জেনে ত্বককে ভালো করার জন্য ব্যবহার করে ফেলি। কিন্তু ভালোভাবে না জেনে, একেবারে অজানা কিছু ব্যবহার আমাদের উপকার তো করেই না, উলটে নানা বিপদ ডেকে আনে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার, আমাদের ত্বকের ওপর দাদ বা চুলকানি হলো। বাজার থেকে যে কোনো একটা ক্রিম কারোর পরামর্শ (চিকিৎসক নন এমন ব্যক্তি) মতো এনে ব্যবহার করতে লাগলাম। প্রকারান্তরে আমাদের ত্বকের বিপদ কিন্তু আমরাই আবার ডেকে আনলাম। কেননা অধিকাংশ ক্রিম স্টেরয়েড নির্ভর। সাময়িক স্বস্তি দিলেও, স্থায়ী স্বস্তি দেয় না। উলটে অন্য প্রতিষেধক ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে ত্বকের কোনো রকম অস্বাভাবিকতাকে নির্মূল করতে পারা যায় না। তাই ত্বক আমাদের দর্শনধারীর কাজ করে। তাকে ঠিক রাখতে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখলেই ত্বকের বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অবহেলা একেবারেই করবেন না। বিশেষ করে, এই গরমকালে ফোঁড়া, দাদ, ফাঙ্গাল ইনফেকশন সমেত নানা অস্বাভাবিক বিষয় দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের কাছে যাবেন পরামর্শ নিতে।

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, গরমকালে একটু বেশি বার স্নান করলে কি ত্বক ভালো থাকে? আমি বলি, যাই করুন না কেন, ত্বককে ঠিক রাখার জন্য হাইজিনের দিকটায় বেশি নজর দিতেই হবে। এই গরমে আপনি তিনবার স্নান করতেই পারেন। কিন্তু আমাদের সারদিনের ব্যস্ততায় সেটা সম্ভব নয়। তাই হাইজিনের দিকে লক্ষ্য রেখে দুবার স্নান করা যেতে পারে। অনেকে এসে আরেকটা প্রশ্ন করে, যে তাঁরা অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করছেন। বিষয়টা ঠিক করছেন না বেঠিক করছেন? এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ওই ব্যবহার করা বস্তুটিতে কতটা অ্যালোভেরা কন্টেন্ট আছে? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে খুব সামান্য পারসেন্টেজে আছে। এই ধরনের জেল উপকারের জায়গায় অপকার করে বেশি।

অনুলিখন : স্বপন দাস

ত্বক ঠিক রাখতে কী করবেন

১. সহজ পাচ্য খাবার খান।

২. জল একটু বেশি খান,

৩. প্রতিদিনের মেনুতে শুক্তো রাখুন সামান্য হলেও সবজি সহযোগে তেতো খান,

৪. বাইরে বেরলে সঙ্গে ছাতা আর জলের বোতল নিন, রৌদ্রে অবশ্যই ছাতা ব্যবহার করুন,

৫. শরীরের যে অংশ বাইরে থাকে, সানস্ক্রিন লোশন লাগান। সারাদিন পর ফিরে এসে একটু ভালো ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।

৬. শরীরের হাইজিনের বিষয়টা লক্ষ্য রুখন,

৭. টাওয়েল বা গামছা আলাদা ব্যবহার করুন, আর যেন এই গামছা শুকনো থাকে সব সময়,

৮. ঢিলেঢালা হালকা রঙের জামাকাপড় পরুন।

৯. যে কোনো মরশুমি ফল রোজ একটা করে খান,

১০. এই গরমে তেল-মশলা একটু কম খাবার চেষ্টা যেমন করবেন, তেমনি তেলে ভাজা যে কোনো খাবারকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন।

১১. বাইরের খাবার আর বাইরের কাটা ফল একেবারেই নয়,

১২. ত্বকের যে কোনো অস্বাভাবিকতায় উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ সবার আগে নিন।

গরমকালে শরীর সুস্থ রাখার উপায়

পঙ্কজ বিশ্বাস

গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ থাকে এবং দিনের দৈর্ঘ্য রাতের চেয়ে বেশি হয়। পশ্চিমবঙ্গে মার্চের শেষের থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল পড়ে। এই সময় তাপমাত্রা ৩৫ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যায়। এই সময় পানীয় জলের ঘাটতি দেখা যায়। অতিরিক্ত গরমের কারণে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

গরমকালে বেশকিছু রোগ মানুষের মধ্যে বেশি দেখা যায়। কারণ এই সময় আবহাওয়া গরম ও শুষ্ক থাকে। ঘাম বেশি হয়, খাদ্য সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। গরমকালে যে রোগগুলো বেশি হয় তা হলো :

১. ডিহাইড্রেশন বা শরীরে জলের ঘাটতি :

কারণ : অতিরিক্ত ঘাম হলে এবং কম জল পান করলে হতে পারে।

লক্ষণ : শরীর দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, গলা শুকিয়ে যাওয়া, প্রস্রাব কম হওয়া।

প্রতিরোধ : প্রচুর জল পান করতে হবে। ওআরএস মিশ্রিত জল পান করতে হবে। বাইরে কোথাও ঘুরতে গেলে জলের বোতল সঙ্গে রাখতে হবে।

২. হিট স্ট্রোক :

কারণ : দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে বা অতিরিক্ত গরমে কাজ করলে হতে পারে।

লক্ষণ : শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট, এমনকী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

প্রতিরোধ : রোদের সময় কম বের হওয়া। টুপি বা ছাতা ব্যবহার করা। শরীর ঠাণ্ডা রাখা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করতে হবে।

৩. ডায়রিয়া :

কারণ : নষ্ট খাবার খেলে ও দূষিত জল পান করলে হতে পারে।

লক্ষণ : পাতলা পায়খানা, বমি, পেটব্যথা, জ্বর এই ধরনের উপসর্গ থাকবে।

প্রতিরোধ : বিশুদ্ধ জল পান করুন। নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার খাবেন না। হাত ধুয়ে খাবার খাবেন।

৪. ঘামাচি ও চর্মরোগ :

কারণ : অতিরিক্ত ঘাম ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব।

লক্ষণ : শরীরে লালচে দানা বের হয়, চুলকানি ও জ্বালা থাকে।

প্রতিরোধ : দিনে ২ থেকে ৩ বার স্নান করুন, সুতির বস্ত্র

পরিধান করুন এবং শরীর শুকনো রাখুন।

৫. ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন :

কারণ : কম জল পান করলে হতে পারে। ঘামের সংক্রমণ ছড়ালে হতে পারে।

লক্ষণ : প্রস্রাবে জ্বালা, বারবার প্রস্রাবে চাপ, তলপেটে ব্যথা হয়।

প্রতিরোধ : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও প্রচুর জল পান করুন।

৬. জ্বর (টাইফয়েড ও ভাইরাল) :

কারণ : ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস সংক্রমণ, দূষিত জল ও খাবার থেকে হতে পারে।

লক্ষণ : শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে শীত লাগে, মাথাব্যথা থাকে, শরীর দুর্বল হয়ে যায়, খিদে কমে যায়।

প্রতিরোধ : সঠিকভাবে রান্না করা খাবার খাবেন, বিশুদ্ধ জল পান করবেন।

৭. মাইগ্রেন ও হিট এক্সহশান :

কারণ : দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে হতে পারে। গরমকালে শরীরের উত্তাপ বেড়ে গেলে হতে পারে।

লক্ষণ : তীব্র মাথা যন্ত্রণা, ঘাম, বমি বমি ভাব, দুর্বলতা থাকে।

প্রতিরোধ : রোদে বের না হওয়া, মাথা ঠাণ্ডা রাখা, ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ মুখ ধোয়া ও চোখে ঝাপটা দেওয়া।

৮. চোখের সমস্যা :

কারণ : সূর্যের আলো চোখে পড়লে হতে পারে। বাতাসে ধুলোবালির কারণেও হতে পারে।

লক্ষণ : চোখ লাল হয়ে যাওয়া, জ্বালাপোড়া, চোখ দিয়ে জল পড়া।

প্রতিরোধ : সানগ্লাস ব্যবহার করা, ঠাণ্ডা জল দিয়ে সকাল সন্ধ্যায় চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া।

গ্রীষ্মকালে সকলের করণীয় :

১. পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করুন : প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন লিটার জল পান করবেন। পানীয় জল মাটির হাঁড়িতে সংরক্ষণ করুন, তাহলে সেই জল ঠাণ্ডা থাকবে এবং শরীরের জন্য ভালো।

২. টাটকা খাবার খাবেন। হালকা ও সহজপাচ্য খাবার খাবেন। যেমন ভাত, ডাল, শাকসবজি, স্যালাড, ফলমূল ইত্যাদি। অতিরিক্ত তেল, তেলে ভাজা, ঝাল মশলা দেওয়া খাবার খাবেন না। শসা, তরমুজ, পেঁপে, আম, ফুটি এগুলো বেশি খাবেন।

৩. পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম : রাতে পর্যাপ্ত ঘুমাবেন (৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত)। দিনের বেলায় অল্প বিশ্রাম নেওয়া ভালো।

৪. সঠিক পোশাক পরিধান : হালকা ঢিলা ও সুতির বস্ত্র পরিধান করবেন। যাতে ঘাম সহজে শুকিয়ে যায়। বাইরে গেলে টুপি ছাতা সানগ্লাস অবশ্যই ব্যবহার করবেন।

৫. রোদ থেকে নিজেকে বাঁচানো : দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাইরে বের হবেন না, কারণ এই সময় সূর্যের তেজ প্রখর থাকে।

৬. যোগাসন : গরমকালে কঠোর পরিশ্রম করবেন না। হালকা যোগাসন, শীতলী প্রাণায়াম করবেন। সকাল-সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা জায়গায় যোগাসন করবেন।

৭. ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধ : যদি অতিরিক্ত ঘাম হয়, তাহলে লবণ ও গ্লুকোজ মিশ্রিত জল পান করবেন। যাদের হাই প্রেসার ও কিডনির সমস্যা আছে তারা লবণ এড়িয়ে চলবেন। প্রস্রাবের রং দেখে বোঝা যায় শরীরে জলের ঘাটতি। প্রস্রাবের রং গাঢ় হলে বেশি করে জল পান করবেন।

৮. ত্বক ও শরীরের যত্ন : বেশি গরম পড়লে দিনে ২ বার স্নান করবেন। ঘামাচি ও ত্বকের সমস্যা হলে নিমপাতা সেদ্ধ করে জল ঠাণ্ডা করে নেবেন। তারপর সেই নিমপাতা সেদ্ধ জল অন্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্নান করবেন।

৮. শিশু ও বৃদ্ধদের যত্ন নিন : এরা দ্রুত হিটস্ট্রোক বা ডিহাইড্রেশনে আক্রান্ত হতে পারে। তাই তাদেরকে পর্যাপ্ত গ্লুকোজ মিশ্রিত জল পান করাতে হবে এবং ঠাণ্ডা পরিবেশে রাখতে হবে।

১০. ঘরের পরিবেশ ঠাণ্ডা রাখুন, সম্ভব হলে ফ্যান, এয়ার কুলার বা এসি ব্যবহার করুন। কাচের জানালা হলে পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখুন। অতিরিক্ত গরম পড়লে দিনের বেলায় ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ রাখবেন। যাতে বাইরের গরম বাতাস ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। সন্ধ্যার পর ঘরের জানালা খুলে দেবেন যাতে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে পারে।

১১. হিটস্ট্রোক থেকে সাবধান : হিটস্ট্রোক দেখা দিলে দ্রুত ঠাণ্ডা জায়গায় নিয়ে যাবেন, ওআরএস বা লবণ চিনি মিশ্রিত জল পান করাবেন। পরিস্থিতি খারাপ দেখলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

১২. অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না। কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে বিরাম দেবেন।

১৩. ভ্রমণের সময় সতর্কতা : বাইরে গেলে সঙ্গে জলের বোতল বা থার্মোফ্লাস্ক সঙ্গে রাখবেন। ছাতা-টুপি-সানগ্লাস-তোয়ালে ব্যবহার করবেন। তোয়ালে বা গামছা দিয়ে কান মাথা বেঁধে রাখবেন।

১৪. বাইরের খোলা খাবার খাবেন না। গরমকালে খাবার তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। অস্বাস্থ্যকর খাবার খেলে ডায়রিয়া হতে পারে।

১৫. প্রাকৃতিক পানীয় গ্রহণ করবেন, যেমন লেবুর শরবত, আমপানা (কাঁচা আম পুড়িয়ে তৈরি করা হয়)। এই সময় মাটির কলসি কিংবা কুঁজোর জল পান করা সবচেয়ে ভালো। এনার্জি ড্রিংকস্, কোল্ড ড্রিংকস্ পান করবেন না— এগুলো শরীরের ক্ষতি হতে পারে।

(লেখক আরোগ্য ভারতীয় উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক)

গরমকালে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, জল ও ছাতা সঙ্গে রাখুন

ডাঃ সুশান্ত মিত্র

একের পর এক ঋতু আসে আর যায়। শীত, বসন্ত, পেরিয়ে আসে গরমকাল। এই পথে একটি ঋতুর পর আর একটি ঋতুর সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। ঋতু আবর্তনে আমাদের শারীরবৃত্তীয় নানা কাজও এগিয়ে চলে আপন ছন্দে। শরীর মানিয়ে নেয় এই পরিবর্তন, মানিয়ে নেয় ঋতুচক্রের নানা প্রভাবের প্রকাশিত রূপ। সেই রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, আবার সেই রূপের প্রভাবে একটু আধটু টালমাটাল অবস্থায় পড়তে হয় আমাদের সবাইকে। এই প্রভাবকে মানিয়ে নিতে গিয়ে আমাদের শরীর নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। এই সমস্যা বড়োরা একটু হলেও সামলে নিতে পারেন। কিন্তু ছোটোরা পারে না। তারা নিজেদের শরীরের কষ্টের কথা বলতে পারে না। বলতে পারে না শরীরের সমস্যার কথা। তাই সেই সমস্যার মুখোমুখী যাতে এই গরমকালে আমাদের সন্তানদের হতে না হয়, না সইতে হয় কষ্ট, সেই সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা যাক।

একবারে দুধের শিশু থেকে কিশোরদের নিয়ে আমি বলব। যারা এই সময়ে বেশ অনেকটাই বেসামাল হয়ে পড়ে। এই বেসামাল হওয়ার একটাই কারণ, ঠাণ্ডা আর গরমের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একরকমের সমস্যা হয়, অন্যদিকে প্রবল গরমের মধ্যে পড়ে আরেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে তারা। এই সমস্যার কারণ একটাই, এই বয়সটাতে আপনার সন্তানের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। এই তৈরি হবার সময়েই ঘটতে পারে নানা বিপত্তি। তার মধ্যে একটি উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো ঠাণ্ডা লাগা। এই সময়ে যেমন ঠাণ্ডা জিনিস যেমন আইসক্রিম বা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় বাড়িতে ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা জল খাবার ইচ্ছা। গরমে খেলাধুলা করে এসে বা দৌড়াদৌড়ি করে এসেই বাড়িতে ঠাণ্ডা জল বা আইসক্রিম খায় অথবা রাস্তাতেই নানা রকম ঠাণ্ডা জিনিস খায়। এতেই বিপত্তি দেখা দেয়। ঠাণ্ডা লেগে যায় খুব সহজেই। নানা রকম সমস্যা দেখা দেয় এই ঠাণ্ডা লাগা থেকেই।

আমি এক্ষেত্রে বলব যতটা সম্ভব আপনার সন্তানকে রোদের তাপ থেকে বাঁচিয়ে চলুন। বেলা দশটার পর রোদের তেজ খুব বাড়তে থাকে এই গরমকালে। তাই এই সময়টাকে মাথায় রেখেই এগোতে হবে। বেশি রোদে বেরোতে না দিলে অনেকটাই রক্ষা কবচ দিতে পারবেন আপনার সন্তানকে। সর্বোপরি সানস্ট্রোক থেকে রক্ষা করতে পারবেন আপনার শিশুকে। এই গরমে হঠাৎ করে ঠাণ্ডা লেগে যায় নানা কারণে, সে কথা আগেই বলেছি। এই ঠাণ্ডা লাগার পিছনে থাকে আরেকটি কারণ, সেটি হচ্ছে অ্যালার্জি। এই অ্যালার্জি থেকেই হাঁচি, কাশি, সর্দি, বুকে সংক্রমণ থেকে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে আপনার সন্তানের শরীরে। প্রখর রৌদ্র বা গরম থেকে

এসেই ঠাণ্ডা জিনিস খেলেই এই অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে। তাই এটাকেও এড়িয়ে চলতে শেখাবেন শিশুকে। আমি বলছি না যে আইসক্রিম বা ঠাণ্ডা পানীয় খাবে না। তবে একেবারে সাধারণ তাপমাত্রায় সন্তানকে রেখে, স্বাভাবিক হলে, তারপর দিন এই সব খাবার।

এখন আমাদের অনেকের বাড়িতেই গরম থেকে বাঁচতে এসি ব্যবহার করে থাকি। আর আমাদের সন্তানরা গরম থেকে এসেই সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। এর থেকেও ঠাণ্ডা লেগে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই এই বিষয়টাতেও একটু লক্ষ্য রাখবেন। এসি চালাবেন, কিন্তু ঘরের তাপমাত্রা এমন রাখবেন, যাতে বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে একটু হলেও সামঞ্জস্য থাকে। বাইরে থেকে খুব ঠাণ্ডা করা অবস্থায় ঘরে ঢুকলে ক্ষতি সবারই হতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের। আর খুব ঠাণ্ডা থেকে বের করার সময় মনে রাখবেন এসি-র তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি। ঘরের তাপমাত্রার সঙ্গে বাইরের তাপমাত্রার সামঞ্জস্য রেখেই সইয়ে শিশুকে বার করবেন। তাহলে অনেকটাই রক্ষা করতে পারবেন ঠাণ্ডা গরমের প্রভাবের হাত থেকে বাঁচাতে।

গরমকালে শিশুদের ডিহাইড্রেশনের সমস্যা দেখা দেয়। বাড়িতে স্যালাইন বানান। দিন আপনার সন্তানকে। আর পেটের নানা রোগ থেকে বাঁচতে দিন হালকা খাবার। তেল-মশলা যুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। এই সময়ে হাজার বায়না করলেও কাটা ফল বা বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। আপনার শিশুকে বাইরে বের করতেই হয় নানা কারণে। তাই হালকা রঙের, ঢিলে ঢালা, পাতলা সুতির জামাকাপড় পরান। মাথায় ছাতা দিয়ে রোদ ঢাকুন।

সবশেষে বলি শিশু বা সন্তানকে একটু বেশি পরিমাণে জল খাওয়াবেন। এই জলই রক্ষা করবে আপনার সন্তানকে। যদি আপনার শিশুর শরীরের মধ্যে এই গরমকালে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখেন, তাহলে কোনো অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

অনুলিখন : স্বপন দাস

গরমে শরীরকে রক্ষা করতে প্রকৃতির সাহায্য নিতে হবে

ডাঃ দেবাশিস পাহাড়ি

গ্রীষ্মের শুরুতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে আমাদের শরীর নিয়ে। নানা জীবাণুর সংক্রমণ যেমন ঘটতে থাকে, তেমনি শরীরও সাথ দিতে চায় না আমাদের। সামান্য কিছু কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেই অসুস্থতা থেকে আমাদের শরীরকে প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে কীভাবে সুস্থ রাখতে পারি? আমাদের শরীরকে রক্ষা করার দায়িত্ব অনেকটাই নিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। আমরা যদি তার দেওয়া দানকে গ্রহণ করি, তাহলে দেখব আমাদের শরীরে সেই অর্থে কোনো রোগ বাসা বাঁধতে পারবে না। তাই আমরা যারা আয়ুর্বেদ নিয়ে একটু চর্চা করি, তাঁরা প্রথমেই বলি, প্রকৃতি যে দান আমাদের প্রতি মরশুমে দেয়, সেই দান কিন্তু আমরা কোনোমতেই অবহেলা করতে পারি না। সবজি হোক বা ফল এগুলিই আমাদের শরীরকে রোগ থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে থাকে। আমাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তাই সবার আগে উচিত আমরা মরশুম অনুযায়ী যে ফল বা সবজি পেয়ে থাকি তা গ্রহণ করব। তারপর অন্য কিছু ভাবব। আজকের দিনে আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করা। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে এই প্রকৃতির দান আমরা। এই প্রকৃতিই আমাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর সবদিক দিয়েই আমাদের রক্ষা কবচ হয়ে রক্ষাও করে চলেছে। বর্তমানে আমরা পুরোপুরি নির্ভর করে আছি প্রসেসড্ ফুডের ওপর। এই নির্ভরতাই আমাদের রোগী বানিয়ে ছেড়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের দিকে নজর টানতে চাই। আমরা এখন সময় বাঁচাবার জন্য, একদিন রান্না করে চারদিন ধরে ফ্রিজে রেখে খাই। সেটা কিন্তু কোনোভাবে আমাদের শরীরের কোনো উপকারে আসেছে না, উলটে ক্ষতি করছে। আরেকটি বিষয়ের দিকেও নজর আনতে চাই, সেটা হলো জাঙ্ক ফুড বা পিৎজা জাতীয় খাবার খেয়ে সেই ছোটোবেলা থেকেই আমরা আমাদের শরীরকে একটু হলেও স্থূলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছি। এই অবস্থা থেকেও আমাদের নানা রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে ছুটে আসছে। এই গরমকালে আমাদের বায়ু ও পিত্ত সংক্রান্ত নানা অসুবিধা দেখা দেয়। এই দুটির কারণে শরীরে দেখা নানা উপসর্গ। গরমকালে এই দুটিকেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই সময়ে আমাদের প্রকৃতি আমাদের নানা জিনিস দিয়েছে। যেমন, শশা, তরমুজের মতো ফল দিয়েছে, তেমনি সবজি হিসেবে দিয়েছে ঢেঁড়স, পটোল, ঝিঙা। এগুলির হালকা ঝোল বা তরকারি খেলে আমাদের বায়ু ও পিত্ত সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য।

গরমের সময় আমাদের গোপন জায়গায় নানা ফাঙ্গাল ইনফেকশন দেখা দেয়। সঙ্গে চুলকানির প্রকোপ। এর থেকে আপনি বাঁচতে পারেন খুব সহজ একটি উপায় অবলম্বন করলে। এই সময়, সারা গায়ে সর্ষের তেল অথবা নারকেল তেল মেখে তারপর স্নান করতে হবে। এতে সারা শরীরের লোমকূপগুলির মুখ যেমন পরিষ্কার হবে তেমনি একটা মসচ্যারাইজারের প্রলেপ পড়বে। আর এই প্রলেপের কারণে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হবে না।

অনেকে বলেন এই সময়ে স্নান করব কতবার? আমরা বলে থাকি, দুই থেকে সর্বাধিক তিনবার পর্যন্ত স্নান করা যেতে পারে।

অনেক এখন নানা ক্রিম বা হারবাল জেল লাগান। তাদের উদ্দেশ্যে বলি, ওইসব ক্রিমে কতটা রাসায়নিক উপাদান আছে সেটা দেখে ব্যবহার করবেন। কেননা আপনি যেটাকে প্রকৃতিজাত বলে ভেবে নিয়ে ব্যবহার করছেন, তাতে রাসায়নিক উপাদান বেশি থাকার কারণে উপকার না করে ক্ষতি করতে পারে। আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বলি, একেবারে প্রকৃতিজাত জেল বা ক্রিম চেনার উপায় হলো, ওই জেল বা ক্রিমে হার্বাল বিষয়টি সিংহ ভাগ উপাদান হিসেবে আছে কিনা সেটা থেখে তবেই কিনবেন। সামান্য মাত্রায় থাকলে কিনবেন না। এই বিষয়ে সচেতনতা থাকাটা সবার ক্ষেত্রেই জরুরি।

সবশেষে বলি, এই সময়ে বায়ু ও পিত্তের অস্বাভাবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেই আপনি সুস্থ থাকবেন। আর বেশি করে জল খাবেন। বাইরে বেরলে সঙ্গে খাবার জল অবশ্যই নিয়ে বেরবেন। পারলে ডাবের জল খান, বাচ্চাকেও খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

(লেখক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক)

সিউড়ীতে তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্যসমাজের উদ্যোগে জাতীয় আলোচনাচক্র

'তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্যসমাজ'-এর ষষ্ঠতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সিউড়ীতে গত ২৭-২৮ এপ্রিল দু'দিন ব্যাপী সারস্বত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় সাহিত্যে জনজাতি চেতনা'-শীর্ষক এক দিবসীয় জাতীয় আলোচনাচক্র। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারক বিপিন মুখোপাধ্যায়-সহ অধ্যাপক নারায়ণ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য এবং অভিনেতা মহাদেব দত্ত। আলোচনাসভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় কার্যক্রম অধিকর্তা অভিষেক রথ, অধ্যাপক ড. তপন গোস্বামী, অধ্যাপক ড. সজল দে, অধ্যাপক ড. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ড. মেরি হাঁসদা প্রমুখ বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সম্পাদক ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সুপর্ণা দাশ রায়। সভাটি সঞ্চালনা করেন ড. নবগোপাল রায়। ভারতীয় সাহিত্যে জনজাতি বিষয়ক বহুমাত্রিক আলোচনায় উঠে আসে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্যতা। এই আলোচনাচক্রের আকর্ষণীয় বিষয় ছিল, ভারতের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা-সহ বহু গবেষক ও গবেষিকার উপস্থাপিত নিবন্ধাবলী।

দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলা সাহিত্যিক সম্মেলন। সংস্থার সম্পাদক ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বীরভূম জেলার সাহিত্যিকদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার জন্য সাহিত্য অকাদেমির কাছে প্রস্তাব ও অনুরোধ রাখেন। এদিন বীরভূম সাহিত্য পরিষদের শতবার্ষিকী সভামঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলা সাহিত্য সম্মেলন। সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি বিপিন মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথিদের আসন অলংকৃত করেন প্রাক্তন অধ্যাপক নারায়ণ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক ও কবি ড. সজল দে, পরিচিত কথাসাহিত্যিক অধ্যাপিকা অহনা বিশ্বাস এবং সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় কার্যক্রম অধিকর্তা অভিষেক রথ। কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন সুবিমল শর্মা, সোমেশ ঠাকুর, দীনবন্ধু দাস, সন্দীপন রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, শিল্পী অধিকারী, পরেশ দে চৌধুরী, গিরিধারী গড়াই, মন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। সংস্থার সম্পাদক ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বীরভূম জেলার সাহিত্যিকদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার জন্য সাহিত্য অকাদেমির কাছে অনুরোধ রাখেন।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সভা

গত ২৭ এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার গোরাবাজার বাবুপাড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (স্কুল শিক্ষা)-এর মুর্শিদাবাদ শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার মোট ৬৫ জন শিক্ষক এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক ও রাজ্য সম্পাদক উজ্জ্বল তালুকদার। সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার সহ-সঙ্ঘচালক গিরিধারী ঘোষ। অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারের। সভায় উপস্থিত শিক্ষকদের সামনে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০'-র বিষয়ে তিনি আলোকপাত

করেন। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক শিক্ষকদের আদর্শ এবং ভারতীয় শিক্ষায় ছাত্র গঠনের উপযোগিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন।

ধুলিয়ান ও মোথাবাড়ির অত্যাচারিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়ালো 'দেশের মাটি'

এক দশক আগে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ থেকে সেবামূলক কাজের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে একটি অরাজনৈতিক, রাষ্ট্রবাদী সংগঠন। হিন্দু জাগরণ, সনাতনী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার যাদের মূল লক্ষ্য। তাদের সেবামূলক কাজ রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকী রাজ্যের বাইরেও। তারাই এবার মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান ও মালদহ জেলার মোথাবাড়ি এলাকার জেহাদিদের দ্বারা নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে এসে দাঁড়ালো। সংগঠনটি ইদানীংকালে পশ্চিমবঙ্গে খুবই পরিচিতি লাভ করেছে। সংগঠনটির নাম— 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির'।

গত ৩ মে খড়দহের কল্যাণনগর বিদ্যাপীঠে আয়োজিত একটি সংক্ষিপ্ত সভায় তারা কিছু নতুন তাঁতের শাড়ি ঘরছাড়াদের পরিবারের মহিলাদের জন্য পাঠিয়েছে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করেছেন সঞ্জয় শাস্ত্রীজী। তিনি জানান, বস্ত্রগুলি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে পীড়িত মানুষের কাছে। এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় বিভাগ প্রচারক বরুণ ঘোষ, নগর প্রচারক দেবার্ঘ্য বসু, সমাজসেবী মলয় চক্রবর্তী-সহ বহু বিশিষ্টজন। দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ও মিলন খামারিয়া। মিলনবাবু বলেন, দেশের মাটি বরাবরই পীড়িত মানুষের কাছে তাদের সাধ্যমতো ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে --- সে করোনা পরিস্থিতিই হোক, বা আমফান ঝড়, অথবা বন্যা, কিংবা হিন্দু নিধন পরিস্থিতি। এ বছর তারা এই রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য ওড়িশাতেও বহু গরিব মানুষকে কম্বল দান করেছে। ধুলিয়ান ও মোথাবাড়িতে জেহাদি আক্রমণে ঘরছাড়া হিন্দু মহিলাদের জন্য পরিধানের বস্ত্র পাঠানোকে 'দেশের মাটি' তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। এই বার্তাই তারা সমাজকে দিতে চায় যে, হিন্দুদের বিপদে তারা সবসময় এগিয়ে আসবে। বরুণ ঘোষ সংগঠনটির কাজকর্মে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এই সংগঠনটিকে আগামীদিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন তিনি।

সচেতন সনাতনী (হিন্দু) সমাজের উদ্যোগে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা প্রদান

গত ১ মে 'উত্তর দমদম সচেতন সনাতনী (হিন্দু) সমাজ'-এর উদ্যোগে এবং বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি-র সহযোগিতায় উত্তর দমদম নগরের ১২ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ প্রতাপগড় শিব-শনি মন্দির প্রাঙ্গণে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা প্রদানের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক বিবেকানন্দ রায়-সহ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সুবল দত্ত, সুবীর বিশ্বাস, গোপাল গুহ মজুমদার, নারায়ণ মণ্ডল, প্রবীর নাগ, গোপাল বিশ্বাস, অমল নাহা প্রমুখ স্বয়ংসেবক।

বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের বীরভূম জেলার সেবক-সেবিকা সম্মেলন

গত ৪ মে বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলার 'সেবক-সেবিকা সম্মেলন'। বীরভূম জেলার সব ক'টি শিশুমন্দির বিদ্যালয়ে কর্মরত ও সেবাকাজে যুক্ত সেবক ও সেবিকারা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়গুলির সাফল্যে তাঁদেরও সর্বপ্রকার যোগদানের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এদিনের সম্মেলনে সকলের পরিচয়পর্বের পর বিদ্যা ভারতীর লক্ষ্য, কার্যকর্তাদের দায়িত্ব, কার্য যোজনা, ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্বাস্থ্য, অনুশাসন, সম্পর্ক কার্য, বিভিন্ন তথ্যাবলী, টিমওয়ার্ক ইত্যাদি বিষয়ে গভীরভাবে চর্চা হয়।

সম্মেলনে ঘোষিত হয় যে বড়ো, ছোটো বিভাজন নয়। যাঁর যেমন দায়িত্ব, সেই অনুযায়ী সকলকে একত্রে সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে। মানসম্মান, ব্যবহারে শালীনতা প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিতভাবে চর্চা ও বৈঠক অব্যাহত রাখতে হবে। শান্ত-সুন্দর বাতাবরণে সম্মেলনটি সুসম্পন্ন হয়। বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের পদাধিকারীরা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে সেবক-সেবিকাদের আগামীদিনের পথপ্রদর্শন করেন।

'সক্ষম'-এর উদ্যোগে নরেশ ভবনে সুরদাস জয়ন্তী উদ্‌যাপন

'সক্ষম' নামক পূর্ণতার বার্তাবাহী, প্রতিবন্ধকতা বিদায়কারী, রাষ্ট্রভাবনায় চালিত সংগঠন গত ৪ মে তাদের কলকাতা মহানগর শাখার পক্ষ থেকে আয়োজন করে সন্ত সুরদাসের ৫৪৭তম জন্মজয়ন্তী। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'স্বস্তিকা' পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ও অধ্যাপিকা ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক ড. গৌতম মণ্ডল, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ড. অনিমা মণ্ডল, রোগ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুপ্তি মুখোপাধ্যায়, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলেই সুরদাসজীর জীবনের নানা দিক এবং বর্তমানে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সক্ষমের প্রান্ত সভাপতি ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম, প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায়। নারীশক্তির প্রতিনিধি ও দিব্যাঙ্গজনের উপস্থিতিতে এই কার্যক্রম হয়ে ওঠে সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে এক বিশেষ সক্ষমতার মিলন ও সেতু। কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রম ছাড়াও বর্ধমান জেলার কাটোয়ায়, মুর্শিদাবাদ জেলার মহুরাকান্দীতেও এদিন সুরদাস জয়ন্তী পালিত হয় দিব্যাঙ্গ ভাইবোনদের উপস্থিতিতে। সর্বত্রই বার্তা, মূলস্রোতে শামিল করতে হবে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের। দেশের সকল নাগরিকদের মধ্যে যেন দিব্যাঙ্গজনের প্রতি ভালোবাসা থাকে। বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের সেবাই হবে ঈশ্বরের পূজা। প্রচেষ্টা ছাড়া কেউই কখনও সফল হতে পারে না। দিব্যাঙ্গজনের প্রচেষ্টা যেহেতু অতিক্রমণের কাহিনি, অবিকশিত পাপড়ির মেলে ধরার নির্মাণ, তাই এই ফুলফোটার গল্পও সমাজকে শোনাতে হবে।

ফঃ ৪

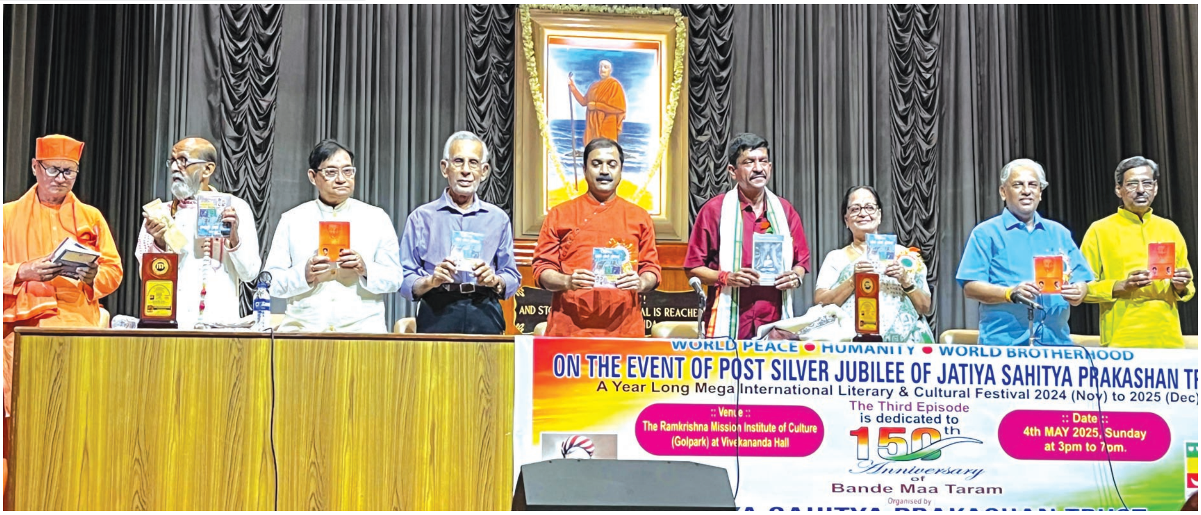

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্টের উদ্যোগে গোলপার্কে আলোচনা সভা

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ৪ মে, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের বিবেকানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য আলোচনা সভা। সেই সঙ্গে আয়োজিত হয় এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। সূচক ভাষণ দেন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শক্তিময় দাশ। সভায় ছিল বহু প্রবুদ্ধ মানুষের গৌরবময় উপস্থিতি। এদিনের উদ্বোধনী সত্রে সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালিত সংস্থা ‘সুরের ছোঁয়া’ সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন। ‘দেশের মাটি মাতৃ মিলন মন্দির’ পরিচালিত একক সংগীত পরিবেশন করেন সঙ্ঘমিত্রা মিশ্র। ‘দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির’ পরিচালিত একক সংগীত পরিবেশন করেন স্নেহাংশু দত্ত। গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয় প্রসেনজিৎ মণ্ডলের ‘রানাঘাট কথামালা’র দ্বারা।

একক সংগীত পরিবেশন করেন সুমিত্রা খাসনবিশ, ড. রুবেল পাল, অনুরাধা চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অসীমা ভড়, দীপান্বিতা বসু সরকার, ব্রততী ভট্টাচার্য প্রমুখ গুণীজন। সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন অদিতি চক্রবর্তী ও রীনা রায়ের ‘ধানসিঁড়ি ভারত’। এছাড়াও অনেক গুণী মানুষ তাঁদের উপস্থাপনা রাখেন দর্শকদের সম্মুখে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুনন্দা হালদার, মল্লিকা রায় ও সুব্রত হাইত। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মিলন খামারিয়া।

বিবেকানন্দ যোগ অভ্যাস সংস্থার উদ্যোগে যোগ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

গত ৪ মে যোগ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ইন্ডিয়ান যোগ অ্যাসোসিয়েশন অধিভুক্ত সহযোগী কেন্দ্র— বিবেকানন্দ যোগ অভ্যাস সংস্থা (ব্যাস কলকাতা)-র দ্বারা আয়োজিত হয় একটি যোগ সচেতনতা শিবির। ‘এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ’— এই মূলমন্ত্রটি ভারত সরকার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রোটোকল হিসেবে ঘোষণা করেছে। পুরো প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি কেশব ভবনে এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পরিচালিত হয়, যার মধ্যে ছিল উদ্বোধনী সত্র, দুটি ব্যবহারিক সত্র ও দুটি তাত্ত্বিক সত্র। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বতী বিদ্যাপীঠের পরিচালক ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ড. এনপি সিংহ, যোগের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, আন্তর্জাতিক যোগ বিচারক রণজয় দাস এবং ক্রীড়া ভারতীর সর্বভারতীয় মন্ত্রী মধুময় নাথ। ব্যাস কলকাতার পক্ষে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সচিব আশিস কুমার পাল, অধ্যক্ষ প্রণব সিহি, কিরণ চৌরাসিয়া, বিকাশ সরকার ও ঘনশ্যাম চৌরাসিয়া। ৩০ জন যোগ শিক্ষক এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। যোগব্যায়ামকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বিনা অর্থব্যয়ে মাদকমুক্ত জীবনধারার বিকাশে যোগ শিক্ষকদের ভূমিকার বিষয়টি স্মরণ করা হয়। দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের

কাজ অব্যাহত রাখা এবং এদিন উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য অতিথি ও যোগ শিক্ষকদের ব্যাস কলকাতার তরফে অভিনন্দন জানানো হয়।

বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

গত ১ মে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর ১১৭তম বলিদান দিবস উদ্‌যাপিত হয়। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে মধ্য কলকাতা-স্থিত প্রোগ্রেসিভ হলে এই স্মরণ অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শমীক স্বপন ঘোষ, সাংবাদিক কুণাল বসু ও প্রবীণ বিপ্লবী হরেন বাগচী বিশ্বাস। বিপ্লবী পরিবারের সদস্য সুবীর কুণ্ডু তাঁর স্বাগত ভাষণে নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙ্গালি বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস পৌঁছে বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্তের ভাইপো পরিমল সেনগুপ্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পৌত্র প্রসাদরঞ্জন দাশ, আইএনএ-এর সেনানী সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী প্রফুল্ল সেনের কন্যা পূরবী সেন, বিপ্লবী মানকুমার বসু ঠাকুরের পরিবারের সদস্য কেকা দত্ত রায়, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের পরিবারের দুই সদস্যা রমা রায় ও মিতালি সরকার, বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের পরিবারের সদস্য আদীশ ভট্টাচার্য্য, সাংবাদিক গোপাল চক্রবর্তী ও সৌম্য গাঙ্গুলি, তরুণ চিত্র পরিচালক অমৃতম তৈরি করছেন চিত্র পরিচালক অমৃতম মণ্ডল। সিনেমাটির নাম— 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল চাকী'। এদিনের স্মরণসভায় শর্টফিল্মটির পোস্টারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এদিনের সভায় পরিচালক সুমিত ঘোষের তত্ত্বাবধানে নির্মিত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জীবন আধারিত ৩২ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এই তথ্যচিত্রে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জীবনের অনেক অজানা কাহিনি জানা যায়। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর আত্মবলিদানের ঘটনাটি আত্মহত্যা না পরিকল্পিত হত্যা, সেই বিষয়ে তথ্যচিত্রটি প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরে।

দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। সভাপতির ভাষণে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রফুল্ল চাকীর অবদানের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন— বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র অশোক চাকী, সুব্রত চাকীর কন্যা সানিকা চাকী রায় ও জামাতা সৌরদীপ রায়, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের ভ্রাতুষ্পৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত, বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বক্সীর পৌত্র শোভনলাল বক্সী, বিপ্লবী হৃষিকেশ চক্রবর্তীর নাতনি মিঠু চক্রবর্তী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিবারের সদস্য তথা 'মিশন বিদ্যাসাগর'-এর কর্ণধার অমিতাভ মণ্ডল, তরুণ প্রকাশক অভিষেক ঘোষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত গবেষক, তথা বিশিষ্ট আইনজীবী সমর কুমার গাঙ্গুলি, জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে। সাংবাদিক কুণাল বসুর স্মৃতিচারণে উঠে আসে ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিলের ঘটনা। তৎকালীন অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের বিভিন্ন সদস্যদের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরার মাধ্যমে ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন সাংবাদিক শমীক স্বপন ঘোষ। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জীবনী সংক্রান্ত একটি শর্টফিল্ম

পরের দিন, ২ মে ছিল বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর আত্মবলিদান দিবস। প্রতি বছরের মতো এই দিনেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে কলকাতায় লালদিঘির পাড়ে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর আবক্ষ মূর্তির সামনে একটি স্মরণসভার আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর পরিবারের সদস্য সুব্রত চাকী, তন্দ্রা চাকী, সানিকা চাকী, সৌরদীপ রায় ও অশোক চাকী। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব, চিত্র পরিচালক অমৃতম মণ্ডল ও কলকাতা পুলিশের প্রতিনিধিরা। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

মুর্শিদাবাদ ও কাশ্মীরে হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের ডাকে ধিক্কার সমাবেশ ও প্রতিবাদী পদযাত্রা

কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ— সম্প্রতি ভারত সাক্ষী থেকেছে জেহাদি- সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নৃশংস হিন্দু গণহত্যার। গত ১ মে এই নির্বিচারে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদে, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ ও অন্যান্য সংগঠনের ডাকে দক্ষিণ কলকাতায় বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় থেকে রাসবিহারী মোড় পর্যন্ত সংঘটিত হয় ধিক্কার সমাবেশ ও একটি বিশাল প্রতিবাদী পদযাত্রা। এদিন সমাবেশে সকল অংশগ্রহণকারীদের জমায়েত স্থল ছিল বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। সেখানে অসংখ্য সাধুসন্তদের উপস্থিতিতে শুরু হয় ধিক্কার সমাবেশ। এরপর সেখান থেকে রাসবিহারী মোড় অভিমুখে শুরু হয় পদযাত্রা। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, সনাতনী সংসদের সভাপতি গোবিন্দ দাস, সনাতনী সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রক্তিম দাশ, অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, রাজনীতিবিদ তমোঘ্ন ঘোষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. রাকেশ দাশ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা সঞ্জয় শাস্ত্রী, বিশিষ্ট লেখিকা দেবযানী ভট্টাচার্য্য-সহ অগণিত সাধারণ মানুষ।

একটি মশাল জ্বালিয়ে ধিক্কার সমাবেশ ও পদযাত্রার সূচনা করেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। এরপর সমাবেশে উপস্থিত সকলে মিলে প্রতিবাদের গর্জন তোলেন। পদযাত্রার মধ্য দিয়ে একদিকে উচ্চারিত হলো শান্তির বাণী, অন্যদিকে উঠল প্রতিবাদের ঝড়। ভারত জুড়ে অবিলম্বে হিন্দু নিধন বন্ধ হোক, হিন্দুদের উপর সব অত্যাচার বন্ধ হোক, অবিলম্বে ভারত ছাড়ো জেহাদিরা, পাকিস্তান মুর্দাবাদ ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে পদযাত্রাটি রাসবিহারী মোড় অভিমুখে এগোতে থাকে। পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ, হিন্দু সুরক্ষা বাহিনী, সনাতনী সংসদ, হিন্দু রক্ষী দল, বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ ও অন্যান্য হিন্দু সংগঠন। পদযাত্রাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা, মুখ বুজে সন্ত্রাসবাদের আঘাত সহ্য না করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ গড়ে তোলা।

সমাবেশ ও পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সাধুসন্তরা জানান, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ কোনোদিন সমাজে এই বিদ্বেষ চাননি। হিন্দুবিদ্বেষের প্রতিকারের ক্ষেত্রে তিনি চেয়েছিলেন হিন্দুদের জাগরণ ও হিন্দুসমাজের সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জেহাদির দ্বারা হিন্দু হত্যা, মন্দির ভাঙচুর, ঘরবাড়ি-দোকান লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ ও মা-বোনেদের উপর পৈশাচিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁরা ধিক্কার জানান।

পদযাত্রা শেষে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে গর্জে ওঠেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। তিনি বলেন— 'যদি হিন্দু মা-বোনেদের উপর নির্যাতন চলতে থাকে, তবে আমরা হিন্দু সনাতনী সমাজ ও সন্ন্যাসীরা ছেড়ে কথা বলব না। আমরাও দেখে নেব এর শেষ কোথায়। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের বেছে বেছে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে, যেভাবে তাঁদের উপর নিপীড়ন চলছে, নারীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জেহাদিরা যেভাবে গুলি করে হিন্দুদের হত্যা করেছে— আমরা এর শেষ দেখতে চাই। দেখতে চাই শত শত সন্ন্যাসীকে এই জেহাদি শক্তি কীভাবে আটকে রাখতে পারে। আগামীদিনে এই সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাব আমরা কীভাবে দিতে পারি তা ঠিক করতে হবে। সমস্ত হিন্দুসমাজকে এক হয়ে এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। নতুন সূর্যোদয় হবেই।'

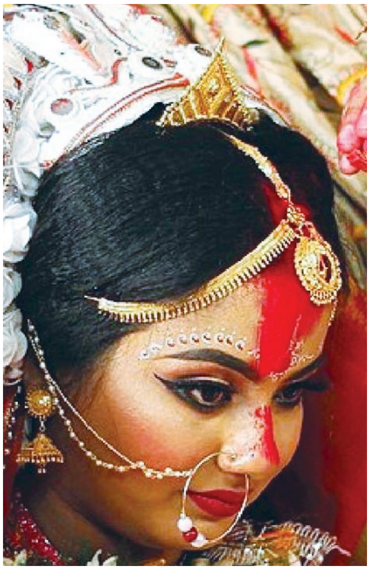

ভারতীয় নারীশক্তির প্রতীক সিঁদুর

নন্দলাল ভট্টাচার্য

জননী তোমার ওই সীমন্ত রেখায়
বহিছে সদানীরা শুদ্ধ কল্লোলিনী
সৌন্দর্যের সোল্লাস শহরে শহরে
উচ্ছ্বসিত রঙ্গে তুমি দেবী কল্যাণী।
তটিনীর তট-বাঁধা সিন্দুর-শোভা
অরুণ-রাগে দীপ্ত রূপাতীত বিভা
সে আলোকে শায়কে বিদ্ধ অরির
তামস কৃষ্ণ-গাঢ় অন্ধকার।
জননী তোমার ওই আরক্ত সিঁদুর
ত্রাতা হয়ে খুলে দিক শান্তির দ্বার।

আদি শঙ্করাচার্য 'আনন্দলহরী'-তে এইভাবেই মুখর হয়েছেন পূর্ণ প্রজ্ঞায়— 'তনোতু ক্ষেমং ন-স্তব বদনসৌন্দর্য লহরী পরীবাহ স্রোত সরণিয়ির সীমন্ত সরণিঃ'— (৪৪)।

ভারতজীবনে সিঁদুর কেবলই নারীর অঙ্গশোভা প্রসাধন নয়, সিঁদুর হলো তেজ, ভালোবাসা-প্রেম, শক্তি ও শান্তিরও প্রতীক। সেই অর্থ না জানার কারণেই যুগে যুগে ঘটেছে ভ্রান্তি। ভুল ধারণায় বারবার এসেছে আঘাত। কিন্তু তার নিজস্ব ক্ষমতায় সবকিছু প্রতিহত করে তুলেছে বিজয়কেতন। এরই সাম্প্রাতিক উদাহরণ পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে অকারণ অন্ধতায় হিন্দুনিধনের প্রতিক্রিয়া ভারত-শক্তির 'অপারেশন সিন্দুর' বা সিঁদুর অভিযানে। মাত্র পঁচিশ মিনিটে অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের একশো কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে শতাধিক জঙ্গি নিকেশ করে ভারত-নারীর সিঁদুর মোছার পালটা মার দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিস্মিত করেছে বিশ্ববাসীকে— স্থাপন করেছে সেনা সাফল্যের অনন্য নজির।

বৈসরনের ঘটনার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, পাতালে লুকোলেও ঘাতক জঙ্গিদের টেনে বের হত্যা করা হবে। কথা রেখেছেন তিনি। 'আপারেশন সিঁদুর' তাঁর সেই কথা রাখারই এক সত্যনিষ্ঠ উদাহরণ। এই অভিযানের নামকরণও প্রধানমন্ত্রী মোদীরই। কিন্তু প্রশ্ন, এতো বিষয় থাকতে কেন নাম দিলেন সিঁদুর অভিযান?

উত্তর, নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে যে বন্য উল্লাসে মেতেছিল জঙ্গিরা, তাদের সমুচিত জবাব দিতে এবং পতিহারাদের সঙ্গে সহমর্মিতা দেখাতেই এই সেনা অভিযানের এবংবিধ নামকরণ।

এহ বাহ্য। এই সাধারণ সাযুজ্য ছাড়াও সিঁদুর ভারতীয় জীবনের এক চিরায়ত ঐতিহ্যের প্রতীক। স্মরণাতীতকাল থেকেই সিঁদুর ভারতীয় জীবনকে দিয়ে আসছে শক্তি, শান্তি এবং প্রেমের সন্ধান। ভারতীয় নারীর বিথির সিঁদুরকে তসলিমা নাসরিনের মতো যাঁরা মনে করেন পুরুষতান্ত্রিক স্বৈরাচার ও শাসনের প্রতীক, তাঁরা ভারতীয় জীবনের সঙ্গে সিঁদুরের অস্তিত্বের কথা জানেন বলে মনে হয় না।

ঐতিহাসিকরা জানাচ্ছেন, সিন্ধু-সভ্যতারও (৩৩০০-১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আগে বালুচিস্তানের মেহেরগড়ে (৫৫০০-৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) নিওলিথিক সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেখানেও সিঁথি রাঙাতে রত নারীমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। মহেঞ্জদাড়ো এবং হরপ্পার মতো সিঁদুর ব্যবহারের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমত।

বেদে সরাসরি সিঁদুর পরার কথা না থাকলেও নানা অনুষ্ঠানে তার ব্যবহারের বেশ কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুরাণ ও মহাকাব্যগুলিতে কিন্তু ভারতীয় নারীর সিঁদুর ব্যবহার সম্পর্কে নানা কাহিনি রয়েছে।

দেবমণ্ডলীতে সুন্দর-সুখী দাম্পত্য জীবনযাপনের এক মহত্তর আদর্শ শিব-পার্বতী। দেবী পার্বতী সিঁদুর পরতেন। পরতেন— মহাদেবের সঙ্গে তাঁর অনন্ত দাম্পত্য জীবনযাপনের কামনায়। সিঁদুর পরলে স্বামীর মঙ্গল হবে এই বোধই ছিল তাঁর সিঁদুর পরার কারণ। পুরাণ কাহিনিমতে, দেবী পার্বতী বলেন, যেসব মহিলা সিঁদুর পরবেন তাঁদের স্বামীরা হবেন দীর্ঘায়ু। তাঁদের কখনো ভোগ করতে হবে না

বৈধব্যযন্ত্রণা।

বিভিন্ন পুরাণে আছে, বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধাও কৃষ্ণসঙ্গ বিচ্যুত না হওয়ার কামনায় কপালে দীপশিখার মতো করে সিঁদুর পরতেন।

কোনো কোনো রামায়ণে আছে, সীতার মাথায় সিঁদুর দেখে হনুমান তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তিনি সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছেন? একটু ইতস্তত করে সীতা বলেছিলেন, এই সিঁদুর হলো তাঁর রামকে ভালোবাসার নিদর্শন, এটা তাঁর প্রেমের প্রকাশ।

একথা শুনে শ্রীহনুমানের মনে হয়েছিল, সিঁদুর পরা হয় ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে। আর তাই তিনি সারা দেহ সিঁদুরময় করে তোলেন। ওই কারণেই শ্রীহনুমানের মূর্তি সিঁদুর বর্ণ। সারা দেহ তাঁর সিঁদুর রঞ্জিত। ভক্তরা ওই কারণেই হনুমান মূর্তিকে সিঁদুর মাখিয়ে থাকেন।

মহাভারতে আছে, হস্তিনাপুরের রাজসভায় লাঞ্ছিত হবার পর দ্রৌপদী এই অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত চুল না-বাঁধার এবং সিঁদুর না পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দুর্যোধন- দুঃশাসনের নিধনের পর তাঁদেরই রক্তে তাঁর সিঁথি আবার রাঙিয়ে দেন ভীম। তারপর থেকেই দ্রৌপদী আবার সিঁদুর পরতে থাকেন।

পুরাণ, মহাকাব্যের এসব কাহিনি এবং নানা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বোঝা যায়, ভারতে প্রায় দশ হাজার বছর আগে থেকেই সিঁদুর ব্যবহারের চল ছিল। এবং এই রীতির পেছনে ছিল বেশ কিছু ধ্যানধারণা।

পুরাকাল থেকেই মনে করা হয়, সিঁদুর হলো তেজ বা শক্তির প্রতীক। ওই কারণে কেবল মহিলারা নন, পুরুষরাও কপালে পরে থাকেন সিঁদুরের তিলক। শুধু নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে নয়, হিন্দুর পূজার্চনার ক্ষেত্রেও সিঁদুরের রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অথবা ঘটে দেবতার অধিষ্ঠান কামনায় ব্যবহার করা হয় তেল সিঁদুর।

ঘটে তেল সিঁদুর দিয়ে যে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা হয়, অথবা পল্লব ইত্যাদিতে সিঁদুর দেওয়া হয় তার পেছনেও রয়েছে হিন্দুর এক বিশ্বাসের প্রকাশ। তেল সিঁদুর হলো তেজের প্রতীক। ঘটে সেই তেল সিঁদুরের চিহ্ন আঁকার মধ্য দিয়ে তাতে দেবতার তেজোময় রূপের প্রকাশ ঘটার উপলব্ধি থেকেই হিন্দুদের পালাপার্বণ বা আচার অনুষ্ঠানে সিঁদুর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মনে করা হয়, পূজাপার্বণে বা বিবাহে সিঁদুরের ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে প্রেম, নিষ্ঠা, আত্মনিবেদন, তেজ ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। তাই-বা কেন, প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বাস করা হয় সিঁদুর হলো সৃজনের অন্যতম প্রতীক। বলা হয়, সিঁথিতে সিঁদুর পরার ফলে যৌন আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। হয় সুপ্রজনন।

এসব তো তেল সিঁদুর পরার সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের কথা। বিজ্ঞান মতেও বলা হয় সিঁদুর পরার মধ্য দিয়ে শরীরের নানা উপকার হয়ে থাকে। সিঁদুর সাধারণত তৈরি হয় হলুদ, চুন ও পারদের মতো নানা যৌগের মিশ্রণে। এই পারদে রয়েছে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। সিঁদুর পরলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে মনে করেন বহু চিকিৎসক।

যোগবিদ ও আয়ুর্বেদিকরাও বিশ্বাস করেন সিঁদুরের মধ্যে রয়েছে নানা অলৌকিক ক্ষমতা। তাঁদের অভিমত, দুই ভ্রূ'র মাঝখানে যেখানে সিঁদুরের টিপ ব্যবহার করা হয়, সেটিই হলো বিভিন্ন স্নায়ুর একটি ভরকেন্দ্র। টিপ পরার সময় সেখানে নিয়মিত যে চাপ পড়ে তাতে মুখমণ্ডলে রক্তচলাচলের বৃদ্ধি ঘটায় এবং বিভিন্ন স্নায়ুকে সক্রিয় করে তোলে। এর ফলে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে বিভিন্ন স্নায়ু ও মুখমণ্ডলের শিরা উপশিরাগুলি সক্রিয় হওয়ার কারণে সুনিদ্রা হয়। ধ্যানেও মনোনিবেশ করা যায়।

একশ্রেণীর যোগী মনে করেন, দুই ভ্রূ'র মাঝখানে যেখানে টিপ পরা হয়, সেটিই হলো দেহের সাতটি চক্রের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র— যোগনেত্র বা আজ্ঞাচক্র। তৃতীয় নয়ন বলা হয় তাকে। তাই টিপ পরার সঙ্গে সঙ্গে ওই অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই যে চাপ সৃষ্টি হয় অথবা অজান্তেই এক ধরনের ম্যাসেজ ক্রিয়া কার্যকর হয়, তাতে মন শান্ত হয়। বিভিন্ন ব্যথার উপশম হয়। এছাড়া টিপ পরার সময় নাক-মাথা-মুখে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পাওয়ায় সাইনাসের মতো রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হয় চোখেরও আরাম।

সিঁথিতে যেখান থেকে সিঁদুররেখা উঠে মাথার যেখানে শেষ হয়, সেখানেই রয়েছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুগ্রন্থি। ওইভাবে সিঁদুর পরায় ওই অঞ্চলগুলিও সক্রিয় ও তেজোময় হয়ে সামগ্রিকভাবে মন ও শক্তিকে বলবান করে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

সিঁদুর হলো নারীর শিরোভূষণ। বলা হয়, মাথায় অবস্থান করেন লক্ষ্মীদেবী। তাই মাথায় সিঁদুর পরলে প্রীত হন তিনি। তাতে সামগ্রিক ভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সংসারেরই। আর সে কারণেই সিঁদুর পরার মন্ত্রে বলা হয়, 'শিরোভূষণং সিন্দুরং ভর্তুরায়ু বিবর্ধনম্, সর্বরত্নাকরং দিব্যং সুন্দরম্ প্রতিগৃহ্যতাম্'।

কেবল সিঁদুর পরার মন্ত্র নয়, তিলক পরার মতোই সিঁদুর পরার সময়ও বলা হয়— সিঁথিতে কৃষ্ণ, কপালে কেশব, কণ্ঠে গোবিন্দ, শঙ্খে মধুসূদন এবং বস্ত্রে মাধবকে নমস্কার করছি।

সব মিলিয়ে সিঁদুর ভারতীয় জীবনের এক অপরিহার্য বিষয়। সিঁদুর হলো নারীশক্তির প্রতীক। আর তাতেই হাত দিয়েছিল জঙ্গিরা। আর তাই তাদের দমনে 'সিঁদুর অভিযান'-এর চেয়ে ভালো আর কোনো নাম হতে পারে না।

ব্রজধামের শ্রীশ্রী যোগমায়া কাত্যায়নী দেবী

অর্ণব দাস

"যোগমায়া যোগেশ্বরী জগৎ পালিকা,
এই জগবাসী জীব তব বালক-বালিকা...
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃতিক লীলা করিবারে,
যোগমায়া রূপে অবতীর্ণ অবনীতে..."

বঙ্গের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণ দাস দেব তাঁর অন্তরের ভক্তিরস মিশ্রিত করে দু'নয়নের বারিধারার সিক্ত হয়ে শ্রীজগজ্জননী জগন্মাতার সম্মুখে এই সুদুর্লভ পদটি কীর্তন করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ তাঁর এই 'শ্রীগুরু কৃপার দান'কে বুকে আঁকড়ে ধরে জগদ্বাসীকে প্রেমসুধা পান করিয়েছিলেন। অনুভূতির সঙ্গে আচরণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ব্রজের সেই অপ্রাকৃতিক লীলাকথা— শ্রীযোগমায়া কাত্যায়নী দেবী এবং শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব হলেন জগতের আদি পিতা-মাতা। তাঁদের কৃপা হলে তবে ব্রজরস আস্বাদন করা যায়, প্রবেশ করা যায় বৈষ্ণবীয় সাধনায়। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ মতে শ্রীরাধারানির সঙ্গে ব্রজগোপীগণ শ্রীশ্রীযোগমায়া কাত্যায়নী দেবীর উপাসনা করে তাঁদের প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীগোবিন্দকে প্রিয়তম রূপে লাভ করেছিলেন, যে ব্রতের ফলে ব্রজবধূগণের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়েছিল। সেই ব্রত জগতে শ্রীকাত্যায়নী ব্রত নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই ভাব অনুসরণ করে আজও গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তগণ একমাস ব্যাপী শ্রীকাত্যায়নী ব্রত পালন করে থাকেন, তাঁদের ভজনের অঙ্গ হিসেবে কপালে ধারণ করেন শ্রীশ্রীযোগমায়া কাত্যায়নী দেবীর প্রসাদি সিঁদুর।

একান্ন সতীপীঠের মধ্যে অন্য একটি পীঠ হলো বৃন্দাবনের শ্রীকাত্যায়নী সতীপীঠ অথবা শ্রীউমা শক্তিপীঠ। শ্রীশ্রী আদ্যাস্তোত্রে বর্ণিত 'ব্রজে কাত্যায়নী পরা' যে দেবীর কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন দেবী কাত্যায়নী। শ্রীধাম বৃন্দাবনের এই স্থানে দেবী সতীর কেশগুচ্ছ মতান্তরে দেবীর আংটি পতিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে যোগীরাজ স্বামী কেশবানন্দ মহারাজ এই স্থানে সুবিশাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে শ্রীকাত্যায়নী দেবীর পাশাপাশি দেবীর ভৈরব শ্রীবটেশ্বর শিব, শ্রীগণেশ, শ্রীসূর্য ও শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পূজিত হয়ে চলেছেন। ভারতবর্ষের এই মন্দির যেন পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। আজও প্রাচীন প্রথা মেনে নবরাত্রি উপলক্ষ্যে চলে দেবীর বিশেষ পূজা। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তগণ আসেন দেবীর দর্শন করে তাদের মনস্কামনা পূরণ করতে। মাতা কাত্যায়নী সকলের দুঃখ-কষ্ট দূর করে চতুর্বর্গ ফল দান করেন, ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হন ভক্তি রূপে, মনুষ্য জীবকে অগ্রসর করেন তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে। ভক্তিলাভে সার্থক করান আমাদের এই মনুষ্য জীবন। □

স্বাধীনতাযুদ্ধের এক অগ্নিকন্যা
বীণা দাস

প্রবীর আচার্য্য

বীণা দাস ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নারী স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর জন্ম নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। কিন্তু তাঁদের আদি বাড়ি ছিল চট্টগ্রাম। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা বেণীমাধব দাস ছিলেন কটকের র‍্যাভনশ কলেজিয়েট স্কুলের সেই প্রখ্যাত প্রধান শিক্ষক যাঁকে সুভাষচন্দ্র বসু নিজের বিপ্লবী জীবনের গুরু বলে মানতেন। বীণা দাসের মা ছিলেন সরলা দাস এবং দিদি ছিলেন বিপ্লবী কল্যাণী দাস।

বীণা দাস কলকাতায় এসে ভর্তি হন বেথুন স্কুলে। সেখানেই তাঁর বিপ্লবী জীবনের হাতেখড়ি। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সহপাঠিনী সুহাসিনী দেবীর হাত ধরে তিনি ও তাঁর দিদি কল্যাণী দেবী গুপ্ত সমিতিতে নাম লেখান। অসহযোগ ও জাতীয় আন্দোলনের যোগ দেওয়ার কারণে তাঁর দাদা কারাবরণ করেন। আসলে বেণীমাধব দাসের রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গোটা পরিবারই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। সে সময় যুগান্তর দলের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে বীণা দাসের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্য বেথুন কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ১৯৩০ সালে ডালহৌসির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য ছোটো ছোটো দলের নেতৃত্ব দেন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেন।

গুপ্তসমিতি থেকে বীণা দেবী পেয়েছিলেন একটি আগ্নেয়াস্ত্র। ১৯৩২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। এই সমাবর্তনে গভর্নরের হাত থেকে তাঁর বিএ পাশের সার্টিফিকেট নেওয়ার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তখন বঙ্গের ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যালিন জ্যাকসন। আচার্যের হাত থেকে বিএ পাশের শংসাপত্র নিতে মঞ্চে উঠে এলেন বীণা দাস। কিন্তু শংসাপত্র নেবেন কী! গভর্নর কুখ্যাত স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে পরপর পাঁচটি গুলি চালালেন। দুর্ভাগ্য, অনভ্যস্ত হাতের গুলি ব্যর্থ হলো। এই সময় জ্যাকসনকে রক্ষা এবং বীণা দাসকে ধরে ফেলার কৃতিত্ব অর্জন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হাসান সোহরাওয়ার্দি।

জেল হাজতে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হলো। কিন্তু শত অত্যাচারেও কোনো বিপ্লবীর নাম ফাঁস করলেন না। আদালতে বীণাদেবী স্ট্যানলিকে গুলি করার দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন। কুড়ি বছরের সাজা হয়ে গেল। তাঁকে পাঠানো হলো প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখান থেকে মেদিনীপুর জেল। সেখানে স্বদেশী মহিলা কয়েদিদের উপর চলতো অকথ্য নির্যাতন। তার প্রতিবাদে বীণা দাসের নেতৃত্বে শুরু হলো অনশন। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন তিনি। কর্তৃপক্ষ কয়েদিদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলো।

হঠাৎ তাঁকে পাঠানো হলো কলকাতার সেন্ট্রাল জেলে। গান্ধীজী এলেন জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। জেলেই তাঁর সঙ্গে তর্ক শুরু করলেন অহিংস আর সংহিস পথ নিয়ে। আসলে বিপ্লবের পন্থা নিয়ে তিনি সুভাষচন্দ্র বসু এমনকী গান্ধীজীর সঙ্গে তর্ক করতেও পিছপা হতেন না। অবশেষে গান্ধীজীর চেষ্টাতেই ১৯৩৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু তখন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে ভয়ানক ভাবে, চেনাই যায় না তাঁকে।

১৯৪১ সালে অন্তর্ধান করার আগে সুভাষ চন্দ্র বীণাদেবীকে ডেকে পাঠালেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেসের সম্পাদিকা নিযুক্ত হলেন তিনি। সারাভারত কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দিতে বোম্বাই গেলেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেস সম্পাদক থাকাকালীন আন্দোলন করতে গিয়ে আবার গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করলেন। মুক্তি পেলেন ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রভিন্সিয়াল বিধানসভার সদস্যা ছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালিতে হিন্দু নরসংহারের পরেও সেখানে তিনি ত্রাণের কাজ করতেন।

১৯৪৭ সালেই তাঁর বিয়ে হয় যতীশ ভৌমিকের সঙ্গে। যতীশ ভৌমিক ছিলেন ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে যোগ দিয়ে শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে মেতে গেলেন। ১৯৫৩ সালে তার স্বামী যতীশ ভৌমিক বদলি হয়ে এলেন ছোট্ট মহকুমা শহর কাটোয়ায়। সেখানে তিনি পূর্ণ উদ্যমে সমাজসেবার কাজে যোগ দিলেন। গড়ে তুললেন নারী কল্যাণ সমিতি এবং কাটোয়ার ডিডিসি বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ইংরেজি শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিলেন। সমাজে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। কাটোয়া থেকে চলে যাওয়ার পর অন্য একটি স্কুলেও তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন।

পরবর্তীতে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি ও তাঁর স্বামী পেনশন ত্যাগ করলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিফৌজের পাশে দাঁড়ান। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। বীণা দাসের শেষ জীবন বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। শিক্ষিকা হিসেবে তিনি পেনশন দাবি করেও পাননি। কারণ তাঁর বিএ পাশের সার্টিফিকেট ছিল না। এই সার্টিফিকেট না থাকার কারণটা যে মর্মান্তিক সেটাও বাম সরকার বোঝেনি। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি হরিদ্বার চলে যান। শেষ জীবনে বড়ো নিঃসঙ্গতায় ভুগতেন বীণা দাস। ১৯৮৬ সালের ২৬ জানুয়ারি হৃষিকেশের রাস্তায় পুলিশ এই মহান বিপ্লবীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। সহায় সম্বলহীন হয়ে পথপ্রান্তে মৃত্যুবরণ করেন এই মহান বিপ্লবী। □

অপারেশন সিঁদুর : পহেলগাঁও হামলার যোগ্য জবাব ভারতের

কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য

গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভারতীয় পর্যটকদের উপর ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা একটি নৃশংস হামলা চালায়। সেই হামলায় ২৬ জন হিন্দু পর্যটক প্রাণ হারান। সামরিক পোশাক পরিহিত সন্ত্রাসবাদীরা পর্যটকদের প্রথমে ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা করে ফেলে। তারপর তাদের উপর গুলি চালায়। মুছে যায় অনেক ভারতীয় মহিলার সিঁথির সিঁদুর। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সদ্য বিবাহিত। সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার একটি শাখা 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' প্রাথমিকভাবে এই হামলার দায় স্বীকার করে। হামলায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে পাকিস্তান। পাকিস্তান সরকারের মদতপুষ্ট এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি বহু বছর ধরেই কাশ্মীর জুড়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার পর পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করে ভারত। এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় গত ৭ মে-র মধ্যরাতে ১টা ৫ মিনিট থেকে ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত— ২৫ মিনিট ধরে পাকিস্তানের পঞ্জাব ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একটি সামরিক অভিযান চালায় ভারত। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত সেই অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পাক সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে চলমান সামরিক অভিযানের সাংকেতিক নাম— 'অপারেশন সিঁদুর'। ৭ মে 'অপারেশন সিঁদুর' সম্পর্কে প্রেস ব্রিফিং করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও ভারতীয় বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংহ।

ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর বিশ্লেষণ :

অপারেশনের লক্ষ্য ও তার বাস্তবায়ন : পহেলগাঁও হামলার পর পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা ও হিজবুল মুজাহিদিনের মতো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসা, ট্রেনিং ক্যাম্প, সন্ত্রাসবাদী শিবির, জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা ছিল ভারতের প্রাথমিক লক্ষ্য। এদিন মধ্যরাতে পাক পঞ্জাবের ৪টি এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৫টি— মোট ৯টি স্থানে ১৪টি প্রিসিশন স্ট্রাইক বা নির্ভুল লক্ষ্যে প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে শুরু হয় সেই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন। 'টেরর ইনফ্রাস্ট্রাকচার' অর্থাৎ জঙ্গি ঘাঁটি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ভারতীয় স্থল, নৌ ও বায়ুসেনা একযোগে শুরু করে 'অপারেশন সিঁদুর'। পাক সন্ত্রাসের জবাব দিতে ভারতীয় বিমানবাহিনী ব্যবহার করে রাফায়েল যুদ্ধবিমান। যুদ্ধবিমানগুলি ছিল এএএসএম হ্যামার বোমা ও স্কাল্প ক্রুজ মিসাইল (ক্ষেপণাস্ত্র) দ্বারা সজ্জিত। এছাড়াও

ফঃ ৫

ভারত-ইজরায়েলের যৌথ গবেষণার ফসল 'স্কাই স্ট্রাইকার'-নামক লয়টারিং মিউনিশন (বা আকাশপথে আক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র)-ও পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাফায়েলের মাধ্যমে প্রয়োগ করে ভারতীয় বায়ুসেনা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, পাকিস্তানের আকাশসীমাকে লঙ্ঘন না করেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রিসিশন স্ট্রাইক চালায় ভারত। জঙ্গি ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী দ্বারা গৃহীত কৌশলের অংশ হলো এই 'ফোকাসড্' (অর্থাৎ স্থির লক্ষ্য বিশিষ্ট) ও নন-এস্ক্যালেটরি (অর্থাৎ আঘাতের পর অপেক্ষাকৃত কম সামরিক প্রতিক্রিয়া উদ্রেককারী) পদক্ষেপ।

প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা : 'অপারেশন সিঁদুর'-এর অভিঘাতে ভারতের উপর পাকিস্তানের তরফে পালটা আক্রমণের ছিল প্রবল সম্ভাবনা। পাকিস্তানের তরফে আকাশপথে সংঘটিত যেকোনো আক্রমণ প্রতিরোধে কৌশলগত স্থানগুলিতে রাশিয়ান এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করে ভারত। ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধ বিমান ও ড্রোন-বিরোধী এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটির ভারতীয় নাম হলো— 'সুদর্শন চক্র'। গত ৭ মে মধ্যরাতে পাকিস্তানের ৯টি স্থানে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ধ্বংস হওয়ার পরই ভারতের ১৫টি শহর লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান। আকাশপথে সংঘটিত এই আক্রমণের ক্ষেত্রে তাদের হাতিয়ার ছিল ইউএভি (ড্রোন) ও মিসাইল প্ল্যাটফর্ম (ক্ষেপণাস্ত্র)। উল্লেখ্য, ৮০ শতাংশ পাকিস্তানি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রকে আকাশপথেই প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে ভারতের সুদর্শন চক্র।

সামরিক প্রতিক্রিয়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, জবাব, পালটা জবাব : অপারেশন সিঁদুর শুরুর পর পাকিস্তান দাবি করে তারা ৫টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ও অসংখ্য ড্রোনকে গুলি করে মাটিতে নামিয়েছে। তাদের দাবিগুলি ছিল পুরোপুরি ভিত্তিহীন। সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম হতে এই তথ্য সংগৃহীত বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা মহম্মদ আসিফ। অপারেশন সিঁদুরের কারণে অনেক অসামরিক লোকজনের হতাহতের দাবিও করে পাকিস্তান। এর প্রতিশোধ নেবে বলে তারা হুমকিও দেয়।

পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি স্থানে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলিকে ভারতীয় বায়ুসেনা ধ্বংস করে দেওয়ার পর নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতের বিভিন্ন এলাকা লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালাতে থাকে পাকিস্তান। নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন অঞ্চলে তারা ব্যবহার করছে আর্টিলারি বা কামান বাহিনী। পাক সেনার আক্রমণে ভারতে অনেক স্থানীয় অধিবাসীর হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাতে থাকে পাকিস্তান। তার পালটা জবাবে পাকিস্তানি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে অকেজো করতে লাহোরে 'সাপ্রেশন অফ এনিমি এয়ার ডিফেন্সেস' বা সিয়াড অপারেশন চালায় ভারত। অপারেশন সিঁদুরের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী শিবির ও জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকেই টার্গেট করে ভারত। কোনো সিভিলিয়ান টার্গেট (অসামরিক লক্ষ্যবস্তু) বা পাকিস্তানের কোনো সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়নি ভারতের এই সামরিক অভিযান।

আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিক্রিয়া : ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশই পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশ। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মদতে জেহাদ অব্যাহত রয়েছে বহু বছর ধরে। ভারত তার প্রত্যুত্তর দিলে পাকিস্তানের তরফে জারি রয়েছে হামলা ও আক্রমণ। এই প্রক্রিয়ায় দুটি পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে সংঘাত ক্রমবর্ধমান। ভারত-পাক সংঘাতের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মহল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য (ব্রিটেন), চীন, রাশিয়া-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশকে এই মুহূর্তে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন। ফুল স্কেল ওয়ার (সম্মুখ সমর বা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ) এড়াতে তাঁরা দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ঘটনাক্রম :

২২ এপ্রিল, ২০২৫ : জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জন হিন্দু পর্যটক নিহত হন।

৭ মে, ২০২৫ : পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করল ভারত।

৮ মে, ২০২৫ : পাকিস্তানের তরফে ভারতীয় যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানোর দাবি। নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে পাকসেনার অনবরত আক্রমণ; ভারতেরও পালটা জবাব।

৯ মে, ২০২৫ : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বড়ো মাপের সংঘাতের আশঙ্কা বৃদ্ধি। দু'তরফের সামরিক প্রতিক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রণরেখার দু'পারে উত্তেজনা হ্রাসের জন্য ভারত ও পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক মহলের বার্তা।

১০ মে, ২০২৫ : ভারত-পাকিস্তানের সামরিক টানাপোড়েনের মধ্যে দু'পক্ষকে 'ডি-এস্ক্যালেশন' বা সংঘাত থামানোর অনুরোধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। দু'তরফের ডিজিএমও (ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন্স)-র বাক্যালাপ এবং সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা। রাতে পাকিস্তানের দ্বারা সংঘর্ষবিরতি ভঙ্গ। জম্মুর নাগরোটায় ভারতের সামরিক ঘাঁটিতে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের হামলা। এছাড়াও কাশ্মীরের বিভিন্ন সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় জনবসতি লক্ষ্য করে গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকে পাকিস্তান। কভার ফায়ারের মাধ্যমে ভারতের মাটিতে জেহাদিদের অনুপ্রবেশে সাহায্য করে পাক সেনা।

কৌশলগত তাৎপর্য : সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়ে ভারত সরকার যে দায়বদ্ধ তা আরেক বার প্রমাণ করল অপারেশন সিঁদুর। দু'দেশের মধ্যে সামরিক টানাপোড়েন বৃদ্ধি প্রতিরোধের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালানোর জন্য উন্নত সামরিক প্রযুক্তি এবং গোয়েন্দা তথ্যের কৌশলগত ব্যবহারের বিষয়টিও তুলে ধরল ভারতের এই সামরিক অভিযান।

গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি শিবিরগুলিকে গুঁড়িয়ে দিতে 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করে

ভারত। এই সামরিক অভিযান চলাকালীন ভারতীয় সেনা তাদের নিজেদের লক্ষ্যে স্থির ছিল। অসামরিক লোকজনের বসতি ও এলাকাগুলিকে এড়িয়ে সন্ত্রাসবাদী শিবিরগুলিকেই তারা টার্গেট করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল পাক জঙ্গি ও জঙ্গি ঘাঁটি। এর বিপ্রতীপে ভারতের নিরীহ নাগরিকদের টার্গেট করেছে পাকিস্তানি সেনা। তবে ৩১ জন পাক নাগরিক এই হামলায় নিহত হয়েছে বলে দাবি করে পাকিস্তান। ভারতীয় প্রত্যাঘাতকে 'যুদ্ধ' হিসেবে তারা আখ্যা দেয়। পাঁচটি ভারতীয় যুদ্ধবিমানকে তারা গুলি করে নামিয়েছে বলে ভিত্তিহীন দাবি তারা পেশ করে। ভারতকে এর জবাব দেওয়া হবে বলেও তারা জানায়।

পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকেই দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। কয়েকজন পাক কূটনীতিককে বহিষ্কার করে ভারত। সিন্ধু জল চুক্তি রদ করে। নিয়ন্ত্রণ রেখা বা সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিংগুলি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। পালটা প্রতিক্রিয়ায় 'সিমলা চুক্তি' স্থগিত থাকবে বলে জানায় পাকিস্তান। ভারতীয় বিমানের জন্য তাদের আকাশসীমা বন্ধের ঘোষণা করে। দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যও বন্ধ থাকবে বলে জানায় পাকিস্তান।

নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকে পাকিস্তান। ভারতের অসমারিক জনবসতি এবং ভারতীয় সেনার সামরিক ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকসেনা। যোগ্য জবাব দেয় ভারতও। পাকিস্তানের শেলিঙের ফলে জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে নিহত হন অনেক ভারতীয় নাগরিক। হতাহতের ঘটনা ঠেকাতে উদ্যোগী হয় আন্তর্জাতিক দুনিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ব্রিটেন-সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা অবিলম্বে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা হ্রাসের আহ্বান জানিয়েছেন। দ্বিপাক্ষিক সংঘাত রোধে উভয় দেশকে আগামীদিনে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আলোচনায় বসতে তারা অনুরোধ করেছেন।

কাশ্মীরে হিন্দু পর্যটকদের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর সন্ত্রাসবাদ দমনে কড়া

পদক্ষেপের বিষয়টি ভারত জুড়ে অনুভূত হচ্ছিল। পাক সন্ত্রাস দমনে সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে দেখা যাবে :

ভারতের রাজনৈতিক ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি :

সন্ত্রাসবাদের প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি : বিগত বহু দশক ধরে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে জম্মু-কাশ্মীর-সহ ভারতের অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হয়ে চলেছে পাক সন্ত্রাসবাদ। এই 'সীমা-পার সন্ত্রাসবাদ' বা 'ক্রস-বর্ডার টেররিজম'-এর ব্যাপারে গত ১০ বছর ধরে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে ভারত। কোনোরকম সন্ত্রাসবাদ সহ্য করবে না নতুন ভারত। ভারতের বুকে যেকোনো সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা ঘটলেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়। সীমান্তের ওপারে যে ঘাঁটিগুলি থেকে ভারতের বুকে এই আক্রমণগুলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, সেই ঘাঁটিগুলিকে টার্গেট করে গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ভারতের তরফে চলে সামরিক অভিযান।

সামরিক প্রত্যাঘাত ও সেনা অভিযান : সাম্প্রতিক অতীতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রত্যাঘাত করে সাফল্য পেয়েছে ভারত। ২০১৬ সালে উরি ও ২০১৯ সালে পুলওয়ামাতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর উপর পাক সন্ত্রাসবাদী হামলারপর যথাক্রমে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সার্জিকাল স্ট্রাইক এবং বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইকের মাধ্যমে জবাব দেয় ভারত। পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি টার্গেটে প্রত্যাঘাত করে ভারত। টার্গেটগুলির বিবরণ :

(১) মারকাজ সুভান আল্লা, বাহাওয়ালপুর (পাক পঞ্জাব) : জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান ঘাঁটি। নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে ১০০ কিলোমিটার ভেতরে এটির অবস্থান। ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলার ষড়যন্ত্র এখানে করা হয়।

(২) মারকাজ তৈবা, মুরিদকে (পাক পঞ্জাব) : লস্কর-ই-তৈবার প্রধান ঘাঁটি। নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে ৩০ কিলোমিটার ভিতরে এটি অবস্থিত। মুম্বইতে ২৬/১১ হামলার সন্ত্রাসবাদীদের ট্রেনিং এখানে হয়।

(৩) সরজাল ক্যাম্প, শিয়ালকোট (পাক পঞ্জাব) : নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে ৮ কিলোমিটার ভিতরে ছিল এই ক্যাম্পটির অবস্থান ছিল। এ বছরের মার্চে জম্মু-কাশ্মীরে ৪ জন পুলিশকর্মীকে হত্যাকারী জেহাদিরা এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়।

(৪) মেহমুনা জোয়া ক্যাম্প, শিয়ালকোট (পাক পঞ্জাব) : হিজবুল মুজাহিদিনের প্রধান ঘাঁটি। নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে ১৫ কিলোমিটার ভিতরে এই ক্যাম্পটি অবস্থিত। ২০১৬ সালে পাঠানকোটে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে সন্ত্রাসবাদী হানার পরিকল্পনা ও সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ন্ত্রণ এখান থেকে করা হয়।

(৫) বারনালা ক্যাম্প, ভিমবের (পাক অধিকৃত কাশ্মীর) : নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে ১০ কিলোমিটার ভিতরে ক্যাম্পটি অবস্থিত। পাক সন্ত্রাসবাদীদের আইইডি (ইম্প্রোভাইজড্ এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা বিস্ফোরক) ব্যবহার ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির।

(৬) আব্বাস ক্যাম্প, কোটলি (পাক অধিকৃত কাশ্মীর) : নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে ১৫ কিলোমিটার ভিতরে ক্যাম্পটি অবস্থিত। লস্কর-ই-তৈবার সুইসাইড বোম্বার বা আত্মঘাতী বোমা-সহ হামলাকারীদের

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

(৭) গুলপুর ক্যাম্প, কোটলি (পাক অধিকৃত কাশ্মীর) : নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে ৩৫ কিলোমিটার ভিতরে ক্যাম্পটি অবস্থিত। লস্কর-ই-তৈবার এই ঘাঁটিটি থেকেই জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি ও পুঞ্চ সেক্টরে সক্রিয় থাকে লস্কর জেহাদিরা। ২০২৩ সালের ২০ এপ্রিল পুঞ্চে সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং ওই বছরের ৯ জুন অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের উপর আক্রমণ চালানোর পিছনে ছিল গুলপুর ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিরা।

(৮) সাওয়াই ক্যাম্প, মুজফফরাবাদ (পাক অধিকৃত কাশ্মীর) : নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে ৩০ কিলোমিটার ভিতরে ক্যাম্পটির অবস্থান ছিল। লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের ট্রেনিং ক্যাম্প।

(৯) বিলাল ক্যাম্প, মুজফফরাবাদ (পাক অধিকৃত কাশ্মীর) : জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটি। জঙ্গিদের অস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা : জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার কোনো ঘটনা ঘটলে এই অঞ্চলে সক্রিয় জঙ্গিদের দমনের ক্ষেত্রে তৎপর থাকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। উপত্যকা জুড়ে চলে চিরুনি তল্লাশি। কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনার পর ২০২৪ সালে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী শুরু করে 'অপারেশন অল আউট'। বর্তমানে ভারত-পাকিস্তানের সামরিক টানাপোড়েনের আবহে পশ্চিম ভারতের কয়েকটি বিমানবন্দর বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করেছে ভারত। বিমানযাত্রীদের টিকিট বাতিল হওয়ায় বিভিন্ন বিমান সংস্থা সেই অর্থ ফেরতও দিয়েছে। আইপিএল-এর ক্রিকেট ম্যাচগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে বলে ঘোষিত হয়েছে।

কূটনৈতিক প্রয়াস : সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা দেশ পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক স্তরে একঘরে করতে বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে ভারত। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের 'স্টেট স্পনসরড টেররিজম'-এর শিকার। পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে সেদেশের মাটি থেকে বিশ্বজুড়ে পরিচালিত হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলকে বোঝাতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে ভারত।

রাজনৈতিক স্তরে ও জনমানসে প্রতিক্রিয়া : পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ দমনের ব্যাপারে ভারতের যেকোনো নির্ণায়ক, সামরিক পদক্ষেপকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে ভারতের সব রাজনৈতিক দল এবং সমস্ত শ্রেণীর মানুষ। পাক সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার ব্যাপারে ভারতীয় জনমত সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনার এই আবহে ভারতের জাতীয় সংহতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, 'গুলির জবাব গোলায় দেওয়া হবে'।

ভারত-পাক সামরিক উত্তেজনার আবহে পাকিস্তানের দাবি : গত ৭ মে রাতে ভারতীয় প্রত্যাঘাতের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে পাকিস্তানি আইএসপিআর (ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স)। এছাড়াও ভারতের বিরুদ্ধে তারা ড্রোন (বা ইউএভি) ও ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণের অভিযোগও তুলেছে। আইএসপিআর জানিয়েছে যে ভারতের পাঠানো ২৫টি ইজরায়েলি হারোপ ড্রোনকে মাটিতে নামিয়েছে পাকিস্তান। তাদের আরও দাবি হলো পাঁচটি আধুনিক ফাইটার জেট (যুদ্ধবিমান), একাধিক ড্রোন ও অসংখ্য সৈন্যের মৃত্যুর কারণে ভারত নাকি আতঙ্কিত। বলা বাহুল্য যে, পাকিস্তানের প্রতিটি দাবি মিথ্যে ও পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

ভারতের জবাব : ভারত দাবি করেছে যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। আক্রমণের ক্ষেত্রে ভারতীয় জনবসতিগুলিকে টার্গেট করছে পাকসেনা। ভারতের বিরুদ্ধে আকাশপথে পরিচালিত যাবতীয় পাকিস্তানি হামলা প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে ভারত। জম্মু- কাশ্মীরের কুপওয়ারা, বারামুল্লা, উরি, পুঞ্চ, মেন্ধার ও রাজৌরি সেক্টরে মর্টার ছুঁড়েছে পাকিস্তান। এছাড়াও হেভি ক্যালিবার আর্টিলারি (ভারী কামান) ব্যবহার করেছে পাকসেনা। ভারতও পাক বাহিনীর আক্রমণের জবাব দিয়েছে। গত ৯ মে পঞ্জাবের ভাতিণ্ডা ও ফিরোজপুরে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় পাক সেনা। পাকিস্তানের সব টার্গেটই অসামরিক। কাশ্মীরের বারামুল্লা থেকে গুজরাটের ভুজ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ড্রোন হামলা চালায় পাকিস্তান।

ভারত জানিয়েছে যে, গত ৭ মে-র পর থেকে পাকিস্তানির আক্রমণের কারণে ৩ জন মহিলা ও ৫ জন শিশু-সহ ১৬ জন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে। পঞ্জাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করার সময়ে এক পাক অনুপ্রবেশকারীকে নিকেশ করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। এয়ারক্র্যাফট্ ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রান্তকে আরব সাগরে মোতায়েন করেছে ভারতীয় নৌসেনা।

এছাড়াও, গত ৯ মে মধ্যরাতে পাকিস্তানের করাচি বন্দরে ১৫টি বিস্ফোরণ হয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে। বন্দরটি কার্যত বন্ধ রয়েছে। ভারত তার কয়েকটি বিমানবন্দরকে বন্ধ বলে ঘোষণা করলেও তাদের বিমানবন্দরগুলিকে চালু রেখেছে পাকিস্তান। ফলে তাদের কোনো অসামরিক বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেক্ষেত্রে দায়ী হবে ভারত। সামরিক টানাপোড়েনের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে অসামরিক বিমান পরিবহণকে শিল্ড বা ঢাল করছে পাকিস্তান। গত ১১ মে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে একটি প্রেস কনফারেন্সে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রত্যুত্তরে গত ৯ ও ১০ মে প্রত্যাঘাত করে ভারত। পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করে দেওয়া ছাড়াও ১১টি পাকিস্তানি এয়ারবেস (বিমান ঘাঁটি) ধ্বংস করে দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। ১১টি পাকিস্তানি এয়ারফোর্স ক্যাম্প হলো— নুর খান (চাকলালা), রফিকি, মুরিদ, সুক্কুর, শিয়ালকোট, পাসরুর, চুনিয়ান, সরগোধা, স্কারু, ভোলারি ও জেকোবাবাদ।

(লেখক অখিল ভারতীয় পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের রাজ্য সভাপতি)

গরমকালে নাক, কান ও গলার সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, অবহেলা করবেন না

ডাঃ পীযূষকান্তি মান্না

গরমকাল সমাগত। এখনো ভোরের দিকে একটু একটু ঠান্ডা ভাব থাকলেও বেলা বাড়লে তাপমাত্রা বাড়ছে। আর কয়েকদিন পরেই গরমের মাত্রা আরও বাড়তে থাকবে। এই গরমকালে আমরা সবাই অন্য অনেক কিছুর দিকে লক্ষ্য ও যত্ন নিলেও, কেমন যেন আমাদের নাক, কান বা গলার কোনো সমস্যার প্রতি যত্নশীল বোধহয় একটু কমই হই। ভাবি সামান্য ব্যাপার, কিন্তু এই গরমকালে আমাদের বেশ কিছু মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। যা কিনা ভবিষ্যতে আরও বড়ো আকার নিতে পারে।

গরমকাল মানেই আমাদের একটু হলেও আসক্তি জন্মায় ঠান্ডা সরবত, কোল্‌ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম বা ঘরে ঢুকে এসি-টা চালিয়ে দেওয়া। বিশেষ করে গরমের সময় আমরা এসি-তে বার বার ঢুকি ও বের হই। আবার শরীরকে ঠান্ডা করার জন্য বারে বারে স্নানও করে থাকি। এইসব প্রবণতা থেকেই আমাদের শরীর নানাভাবে ভাইরাল ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়। যার ফলস্বরূপ জ্বর, সর্দি, কাশি লেগেই থাকে। বিশেষ করে শিশু ও বাচ্চাদের মধ্যে এই সংক্রমণের মাত্রাটা একটু বেশিই দেখা যায়।

অত্যধিক গরমে আবার মাথাটা ভারী হতেও দেখা যায়। মাথার যন্ত্রণা, কপালের যন্ত্রণাও অনেকের হয়ে থাকে। এই সময়ে যাঁদের সাইনাসের সমস্যা আছে, সেটাও বাড়ার প্রবণতা থাকে। এই সময়ে একটা সমস্যা হয় নাক থেকে রক্ত পড়া। সেই সঙ্গে এই ঠান্ডা-গরমে

আবার কান ব্যথার সমস্যাও বেশ অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। কান থেকে রস গড়ায় বা কানে কম শোনার বিষয়টিও দেখতে পাওয়া যায়। পুঁজ জমে। অত্যধিক গরমে গলাও শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। গলার স্বরও পালটে যেতে দেখা গেছে এই সময়ে।

এর থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি কাজ অবশ্য করণীয়।

১. খুব ঠান্ডা জল খাবেন না। জলের তাপমাত্রাটা একটু স্বাভাবিক করে খাবেন। তবে তাপমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খেলে খুব ভালো।

২. জল বেশি করে বার বার খান। এটা শুধুমাত্র ডিহাইড্রেশন থেকে আপনাকে বাঁচাবে না, সঙ্গে সঙ্গে গলার ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা থেকে রক্ষা করবে। এই ভাবে গলার স্বরের যত্ন নেওয়া দরকার।

৩. গলায় এই সময়ে ব্যথা হলে হালকা গরমজলে গার্গেল করলে উপশম হয়। মনে রাখতে হবে, গলা বসে গেলে কিন্তু গার্গেল একেবারেই করা যাবে না। চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। চিকিৎসকরা এই গলা ধরার কারণ কী তা অনুসন্ধান করে সারাবার চেষ্টা করবেন।

৪. এই সময়ে কফ বসে যায়। গলার আওয়াজ বেরতেই চায় না। নাক বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাস নিতেও কষ্ট হয় অনেকের। তখন জলের ভাপ নেওয়া আবশ্যিক। এই ভাপ নিলে খুব উপকার হয়।

৫. গরমকালে পুকুরের জলে স্নান করতে বা সাঁতার কাটতে ভালো লাগলেও, এই সময়ে না করাই ভালো। বেশিক্ষণ জলে না থাকাই ভালো। দেখা গেছে এই সময় স্নান করার সময়ে কানে জল ঢুকে যায়। আর সমস্যা সেখান থেকেই শুরু হয়। কানে পুঁজ বা রস গড়াতেও দেখা যায় এর ফলে।

৬. যারা নিয়মিত নাক-কান-গলার সমস্যার জন্য ওষুধ খান, তাঁদের অনুরোধ। এই সময়ে কোনোরকম অবহেলা করবেন না। কারণ গরমকালে নাকের ভিতরের চামড়া এমনিতে শুকিয়ে যায়। তারপর যদি রক্তের চাপ বাড়ে, আর যদি রক্ত পড়ার সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে কিন্তু বড়ো বিপদের আশঙ্কা আছে।

(লেখক নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ)

নীতিশিক্ষা

পাপের বাপ কে?

এক বালক গুরুগৃহে থেকে পড়াশোনা করতো। পড়াশোনা শেষ হলে বারো বছর পর বাড়ি ফিরে বাবাকে প্রণাম করে বলল, বাবা, আমার পড়াশোনা শেষ। আমাকে কাজ করার অনুমতি দিন। বাবা খুব বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন। ছেলেকে বললেন, যাক, তুমি তো পড়াশোনা করে মস্ত বড়ো পণ্ডিত ও বিদ্বান হয়েছো। তোমাকে কাজ দেওয়ার আগে একটা পরীক্ষা নিতে চাই।

যুবক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল, বাবা, আপনি আমার যেকোনো ধরনের পরীক্ষা নিতে পারেন। আমি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ সমস্ত কিছুই আয়ত্ত করে ফেলেছি। বাবা প্রশ্ন করলেন, বলতো, পাপের বাপ কে? ছেলে উত্তর দিল, সে তো আমি বলতে পারবো না বাবা। এই বিদ্যা আমি শিখিনি।

বাবা বললেন, তবে যাও জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এর উত্তর খুঁজে নিয়ে এসো। তা না হলে আমি তোমাকে কোনো কাজ দিতে পারবো না।

যুবক তার বাবার কথামতো বেরিয়ে পড়ল উত্তরের খোঁজে। পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হঠাৎ নজরে পড়ল একটি সুন্দর বাড়ি। উঠোনে তুলসীমঞ্চ। বাইরে গোরু বাঁধা আছে। তার মনে হলো এটা কোনো বৈষ্ণবভক্তের বাড়ি। প্রবেশ করা মাত্র এক যুবতী তাকে আপ্যায়ন করে ভেতরে বসালো। জিজ্ঞাসা করে সেই যুবতী জানতে পারল, যুবক এক মস্ত পণ্ডিত। শিক্ষা শেষ করে বাড়িতে ফেরার পর তার বাবা তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, পাপের বাপ কে? সেই উত্তর সে দিতে পারেনি। তাই সেই উত্তরের

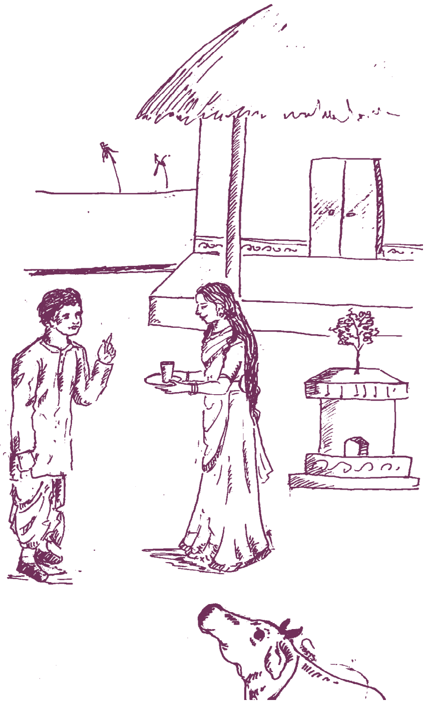

খোঁজে সে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছে।

যুবতী তার বাবার সেই প্রশ্নের কথা শুনে হেসে ফেলল। আর বলল, এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। আপনি আগে আমার বাড়ির নিয়মানুসারে অতিথি সেবা গ্রহণ করুন। এই বলে তাকে এক গেলাস জল দিল। জলের গেলাস হাতে নিয়ে যুবক প্রশ্ন করলো, আপনি কি বৈষ্ণব? উত্তরে যুবতী বললেন, না, আমি এই শহরের একজন নামকরা বারবনিতা।

উত্তর শুনেই যুবক সেই জলের গেলাস ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ছি,ছি,ছি, আমি তো মহাপাপ করে ফেললাম। যাই, গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হয়ে আসি। তখন যুবতী অনুনয়-বিনয় করে তাকে শান্ত করল এবং বলল, আপনি আপনার বাবার প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন না?

যুবক বলল, আর তার প্রয়োজন নেই, আমি আমার গুরুদেবের কাছে গিয়ে জেনে নেবো। যুবতী বলল, আপনি কষ্ট করে অতদূর যাবেন কেন? আমিই উত্তরটি বলে দিচ্ছি।

আমার বাড়িতে প্রবেশ করে যখন আপনার পাপই হয়েছে তখন আগে কিছু সেবা তো গ্রহণ করুন। যুবক রাজি হলো না আর যুবতীও ছাড়বার পাত্রী নয়। যুবতী বলল, আপনি যদি আমার সেবা গ্রহণ করেন তবে আমি আপনাকে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দান করবো।

একথা শোনামাত্র যুবক তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল। মনে মনে ভাবল, পাপ যখন হয়েই গেছে তখন এই সুযোগ গ্রহণ করতে আর দোষ কোথায়? যুবক রাজি হলো। যুবতী তার সেবাসামগ্রী নিয়ে হাজির হলো। যুবক সেবা গ্রহণ করতে যাবে তখনই যুবতী আবার বলল, আপনি যদি আমাকে নিজ হাতে আপনার সেবার অনুমতি দেন তাহলে আমি আপনাকে আরও পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দেবো। যুবক খুশি হয়ে বলল, ঠিক আছে, তাই হবে।

যুবকের খাওয়া শেষ হলে যুবতী ১০টি স্বর্ণমুদ্রা যুবকটির হাতে দিল। তা গ্রহণ করে যুবক বলল, আমি আমার গুরুদেবের বাড়ি চললাম আমার প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে। যুবতী বলল, তার আর প্রয়োজন নেই। আমিই উত্তর দিচ্ছি। আপনি প্রথমে আমার বাড়ি এসে নিজেকে পাপী মনে করেছিলেন। কিন্তু যখনই আমি আপনাকে স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখালাম, তখনই আপনি নিজের পাপের কথা ভুলে গেলেন। তাই সঠিক উত্তর হলো, **পাপের বাপ হলো লোভ।** আপনার বাবাকে এটি বলে দেবেন।

মনোরঞ্জন মণ্ডল

জাতীয় উদ্যান

পেরিয়ার

পেরিয়ার জাতীয় উদ্যান কেরালা রাজ্যের ইদুক্কি ও পাথানমথিতা জেলায় ৯২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। উদ্যানটি তামিলনাড়ুর সীমান্তবর্তী এলাচ ও পাণ্ডালম পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। এটি একটি হাতি ও বাঘ সংরক্ষণাগার। কেরালায় বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রথম আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ১৯৩৪ সালে ত্রিবাঙ্কোরের মহারাজা চিত্রিরা থিরুনাল বলরাম ভার্মা। উদ্যানটি ৩১ কিলোমিটার আয়তনের পেরিয়ার হ্রদকে ঘিরে রয়েছে। উদ্যানে ১৯৬৫ প্রজাতির ফুল, ১৭১ প্রজাতির ঘাস এবং ১৪০ প্রজাতির অর্কিড রয়েছে। এছাড়া আম, জাম, চন্দন, বট, তেঁতুল এবং বাঁশবনে পরিপূর্ণ। উদ্যানে ৪০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জন্তু, যার মধ্যে অনেক বিপন্ন প্রজাতিও রয়েছে। সাদা বাঘও রয়েছে। ২৬৬ প্রজাতির পাখি , ৪৫ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১৬০ রকমের প্রজাপতি রয়েছে। পেরিয়ার হ্রদে ৪০ রকমের মাছ রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৬৮

ঘটীদর্শনেন সময়-জ্ঞানম্- ৩

একটা বাজে - একবাদনম্

দুটো বাজে - **দ্বি** ----।

তিনটা বাজে - **ত্রি** ---।

চারটা বাজে - **চতুর** ----।

সোয়া ১টা বাজে– সপাদ একবাদনম্।

সোয়া দুটা বাজে– ---দ্বি--।

সোয়া ৩টে বাজে– --- ত্রি---।

সোয়া ৪টে বাজে – ---চতুর --।

পৌনে ১টা বাজে–পাদোন-একবাদনম্।

পৌনে ২টা বাজে– -- দ্বি--।

পৌনে ৩টা বাজে---ত্রি--।

পৌনে ৪টা বাজে– --চতুর--।

দেড়টা বাজে– সার্ধ-একবাদনম্।

আড়াইটা বাজে---দ্বি--।

সাড়ে তিনটা বাজে– --ত্রি--।

সাড়ে চারটে বাজে---চতুর--।

ভালো কথা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ইসলামি জঙ্গিরা বেছে বেছে ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে হত্যা করে। এরা ছিল পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি। সেই কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছিল। ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় আমরা স্বস্তিকা পত্রিকার কার্যালয়ের সামনে জমা হয়ে ২৬টি প্রদীপ জ্বালিয়ে ওই হুতাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলাম। রাস্তায় চলাচল করা লোকেরা দাঁড়িয়ে বেদীতে ফুল দিয়ে প্রণাম করছিল। আমরা সবার হাতে একটা করে পত্রক দিচ্ছিলাম। আশেপাশের বাড়ির মানুষরাও রাস্তায় নেমে এসেছিল। মায়েরাও ছিলেন। দু'একজনকে আমরা অনুরোধ করা সত্ত্বেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেনি বা পত্রকও নেয়নি। মনে হয় তারা পাকিস্তানের সমর্থক। যতক্ষণ প্রদীপ জ্বলছিল, ততক্ষণ আমরা রাস্তায় ছিলাম। প্রদীপ নিভে গেলে আমরা যে যার বাড়ি ফিরে গেলাম।

অঙ্কিত কুশওয়াহা, দশম শ্রেণী, মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা-৭।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) জা খো বা র

(২) জ শ মে খো

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) তা স ক্ষ ম্প ম ন্ন

(২) সু মা কা লি ম কু

৫ মে সংখ্যার উত্তর

(১) খবরদার (২) গন্ধমুষিক

৫ মে সংখ্যার উত্তর

(১) শ্রীচরণকমলেষু (২) অঘটনঘটনপটীয়সী

উত্তরদাতার নাম

(১) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা। (২) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (৩) শুভম সরদার, ক্যাং, দ: ২৪ পরগনা। (৪) রেখা সেন, মালদা, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

বিমলশঙ্কর নন্দ

জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে পাকিস্তানের ওপর ভারতের সামরিক প্রত্যাঘাত : বিশ্বরাজনীতির উপর এর প্রভাব

কাশ্মীরের পহেলগাঁও অঞ্চলের বৈসরন উপত্যকায় ২৬ জন পর্যটকের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঠিক দু' সপ্তাহ পরেই ভারত প্রবল প্রত্যাঘাত হেনেছে পাকিস্তানের ওপর। গত ২২ এপ্রিল বিকেলে পর্যটক পরিপূর্ণ বৈসরন ভ্যালিতে ৫ জন জঙ্গি নিরস্ত্র ও নিরীহ হিন্দু পর্যটকদের ওপর একে-৪৭, এম-৪ কারবাইনের মতো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা হিন্দু পর্যটকদের বেছে বেছে তাদের ধর্ম জিজ্ঞেস করে হত্যা করে। তাই নিহত ২৬ জন মানুষের মধ্যে ২৫ জনই হিন্দু। সন্ত্রাসীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্মের মানুষ, কারণ হত্যা করার আগে জঙ্গিরা তাদের স্ত্রীদের সিঁথির সিঁদুর দেখে নিচ্ছিল, পর্যটকদের কলমা পড়তে বলেছিল, এমনকী পুরুষদের গোপনাঙ্গও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। প্রিয়জন হারিয়ে ক্রন্দনরত স্ত্রীদের তাচ্ছিল্যভরে বলেছিল 'মোদিকে বলবে যাও'। ২০০৮ সালে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী হানার পর এটা ছিল সাধারণ মানুষ অর্থাৎ অসামরিক ব্যক্তিদের ওপর সবচেয়ে বড়ো আঘাত। এরপর জঙ্গিদের ওপর এবং জঙ্গিদের মদতদাতা দেশের ওপর প্রত্যাঘাত অনিবার্যই ছিল।

বৈসরন ভ্যালিতে নিরীহ মানুষের ওপর বিশেষত বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত এর এমন পালটা ব্যবস্থা নেবে যা ওরা কল্পনাই করতে পারবে না। এর আগে ২০০৮ সালে ২৬ নভেম্বর পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা মুম্বই শহরে তাণ্ডব চালিয়েছিল। তাদের আক্রমণে প্রায় ১৭৫ জন মানুষ নিহত হন। মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন ইউপিএ সরকার পালটা আঘাতের পথে যায়নি। কিন্তু ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে কঠোরতম অবস্থান গ্রহণ করেছে। এবার শুধু সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্রের জবাব অস্ত্র দিয়েই দেওয়া হচ্ছে না, যে দেশ থেকে এই সন্ত্রাসের মদত দেওয়া হচ্ছে তার ভিতরে গিয়ে সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি এবং তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর ওপর আঘাত হানার নীতি নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের প্রত্যাঘাত প্রথম করা হয়েছিল ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলের বালাকোটে। এর প্রেক্ষাপট ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি ৪৬ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হওয়া। বালাকোট হামলা ভারতের এক নতুন সামরিক নীতির ইঙ্গিতবাহী ছিল। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ যুদ্ধ ঘোষণা না করেও অন্য কোনো দেশের লক্ষ্যবস্তুর ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে। বালাকোট স্ট্রাইকের মাধ্যমে ভারতও সন্ত্রাসবাদ এবং তার মদতদাতা দেশের বিরুদ্ধে এই 'হট পারস্যুট' নীতি নেওয়া শুরু করেছিল। তার ঠিক পাঁচ বছর পর পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গিঘাঁটির ওপর ভারতের বিমান হানা এই 'হট পারস্যুট' নীতির এক সদর্থক সম্প্রসারণ।

গত ৭ মে-র ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ৯টি সন্ত্রাসী ঘাঁটির ওপর হামলা চালায়। এর পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর'। মাত্র ২৫ মিনিটের অপারেশন। তার মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি ঘাঁটিগুলি। বেছে বেছে হিন্দু নিধনের প্রত্যাঘাত এই অপারেশন সিঁদুর। ২২ এপ্রিল জঙ্গিদের হাতে নিহতদের স্ত্রীরা জানিয়েছিলেন মাথায় সিঁদুর দেখেই গুলি চালিয়েছিল জঙ্গিরা। নিহত বিতান অধিকারীর স্ত্রী সোহিনী অধিকারীর আর্তনাদ দেশের মানুষের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। সোহিনী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন— 'জঙ্গিরা বলছিল, যারা যারা মুসলমান তারা সরে যাও। কলমা পড়ো। আর মেরে দিল। যাদের কপালে সিঁদুর দেখল তাদের স্বামীদের মেরে দিল।' সদ্য বিবাহিতারাও স্বামীদের হারিয়েছেন এই জঙ্গি হামলায়। হাতের

ফ ঃ ৬

মেহেন্দির রং উঠে যাওয়ার আগেই তাঁদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়েছিল। হিন্দু মহিলাদের বিবাহিত জীবনের চিহ্ন এই সিঁদুর। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও শুভকামনা। জঙ্গিদের গুলিতে স্বামীর মৃত্যুতে মুছে গেছে সেই সিঁদুর। নৌসেনা অফিসার বিনয় নারওয়ালের মৃতদেহের পাশে নতমুখে বসে থাকা স্ত্রী হিমাংশির ছবি নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতীক হয়ে উঠেছে। জঙ্গিদের নিকেশ করতে এই অপারেশনের কোড নাম 'অপারেশন সিঁদুর' আপামর ভারতবাসীর গভীর ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

গত ৭ মে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে পাক মদতপুষ্ট ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুজন মহিলা অফিসার উইং কম্যান্ডার ব্যোমিকা সিংহ এবং কর্নেল সোফিয়া কুরেশি সেগুলির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। এই ৯টি লক্ষ্যবস্তুই জঙ্গিদের দিক দিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ ভারতে জঙ্গি হামলা চালাতে এগুলিকে বিশেষভাবে ব্যবহার করতো পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। যেমন কাশ্মীরের তাংধার সেক্টরের উলটো দিকে নিয়ন্ত্রণরেখার ৩০ কিলোমিটার ভেতরে 'সোয়াই নালা ক্যাম্প' ছিল বিপজ্জনক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী লস্কর-ই তৈবার একটি বড়ো ট্রেনিং ক্যাম্প। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হানা চালায় যে জঙ্গিরা তারা এখানেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফরাবাদের 'সৈয়দনা বিলাল ক্যাম্প' ব্যবহার করতো আর এক কুখ্যাত জঙ্গি গোষ্ঠী জইস-ই-মহম্মদ। অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে এরকম ৫টা জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। অধিকৃত কাশ্মীরের বাইরে পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে ৪টি জঙ্গি ঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোটলির 'গুলপুর ক্যাম্প' ছিল লস্কর-ই-তৈবার অন্যতম ঘাঁটি। নিয়ন্ত্রণরেখার ৩০ কিলোমিটার ভেতরে অবস্থিত এই ক্যাম্পে ২৬/১১-এর অন্যতম মাথা জাকিউর রহমান লকভি প্রায়ই আসতো এবং শিক্ষার্থীদের মগজে সন্ত্রাসের কথা ঢোকাতো। কাশ্মীরের রাজৌরি সেক্টরের বিপরীত দিকে নিয়ন্ত্রণরেখার ১৩ কিলোমিটার ভেতরে 'আব্বাস ক্যাম্প' ছিল লস্কর-ই-তৈবার সুইসাইড বম্বারদের নার্ভ সেন্টার। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ধ্বংস হওয়া পাঁচ নম্বর জঙ্গি ঘাঁটিটি ছিল ভীমপুরের বার্নালা ক্যাম্প যা নিয়ন্ত্রণরেখার ৯ কিলোমিটার ভেতরে স্থাপন করা হয়েছিল। তার বাইরে ভাওয়ালপুরের 'মার্কাজ সুভানাল্লা ক্যাম্প' ছিল সবচেয়ে দূরের লক্ষ্যবস্তু। আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার ভেতরে অবস্থিত এই ক্যাম্প ছিল জইস-ই-মহম্মদের হেড কোয়ার্টার এবং কুখ্যাত জঙ্গি মাসুদ আজাহারের প্রধান ঘাঁটি। শিয়ালকোটের 'মেহমুনা জোয়া ক্যাম্প' ছিল হিজবুল মুজাহিদিন পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং ক্যাম্প। মুরিদকের 'মার্কাজ তৈবা' ছিল লস্কর-ই-তৈবার মাথা হাফিজ সৈদের প্রধান ঘাঁটি। ভারতে অনেক আক্রমণ হয়েছে এই জঙ্গি ঘাঁটি থেকে। ২০০৮ সালে মুম্বই হানায় ধৃত একমাত্র পাকিস্তানি জঙ্গি আজমল কাসভ এই ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়েছিল। এছাড়া

বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলামি সন্ত্রাসবাদের যে বিপজ্জনক জুটি তৈরি হয়েছে তাকে কঠোরভাবে ধ্বংস করে ফেলা প্রয়োজন। ভারত যেভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রত্যাঘাত করেছে তা অধিকাংশ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেশ যদি অনুসরণ করে, তবে সন্ত্রাসবাদের শিকড়শুদ্ধু উপড়ে ফেলা সম্ভব।

সাম্বা-কাঠুয়া অঞ্চলের বিপরীতে 'সারজাল ক্যাম্প' ছিল জঙ্গিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

এই প্রতিটি জঙ্গি ঘাঁটি বেছে নেওয়া হয়েছে সুনির্দিষ্ট ভাবনাচিন্তা করে। ভারতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর জন্য যে জঙ্গিদের পাঠানো হতো তাদের প্রশিক্ষণ, মগজ ধোলাই প্রভৃতির জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল এই ঘাঁটিগুলি। কোনো কোনো ঘাঁটিকে আবার ব্যবহার করা হতো ভারতে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ ঘটনানোর লঞ্চ-প্যাড হিসেবে। এই সব কটা জঙ্গি ঘাঁটি স্থাপনে প্রত্যক্ষভাবে উদ্যোগ নিয়েছিল পাকিস্তান। এই জঙ্গি ঘাঁটিগুলো শুধু ধ্বংসই করা হয়নি, জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত অনেক জঙ্গিরও মৃত্যু ঘটেছে। পাকিস্তানের অন্যতম ভয়ংকর জঙ্গি নেতা মৌলানা মাসুদ আজাহারের ভাই আব্দুর রউফ আজাহার-সহ পরিবারের ১৪ জন্য নিহত হয়েছে। আগামীতে বেশ কিছু এই গোষ্ঠীগুলির পক্ষে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জঙ্গি ঘাঁটিগুলো যেভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে তা ভারতীয় সেনাবাহিনীর দক্ষতা ও পেশাদারিত্বকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অসামরিক ব্যক্তিদের প্রাণহানি এবং সম্পত্তির ক্ষতি না করে যেভাবে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে তাতে আগামীদিনে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারত গোটা বিশ্বের সামনে রোল মডেল হয়ে উঠতে পারে।

তবে কেবলমাত্র সামরিক প্রত্যাঘাত নয়, সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর পাকিস্তানকে সবক শেখাতে ভারত অন্য কতগুলো ব্যবস্থাও নিয়েছে। ১৯৬০ সালে সম্পাদিত সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করা হয়েছে। পাকিস্তানিদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ককে একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। সমস্ত পাকিস্তানিকে ভারত থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে লালিত কতগুলো নরম নীতি থেকে ভারত সরে এসেছে।

সন্ত্রাসবাদী এবং দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে ভারত তার সুরক্ষা বাহিনীগুলিকে খোলাখুলি নির্দেশ দিয়েছে।

কংগ্রেস আমলে পাকিস্তান সীমান্তে পাকবাহিনীর গুলির জবাব কঠোরভাবে দিতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লাগতো। এখন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আগে কাশ্মীরের পাথরবাজদের বিরুদ্ধেও গুলি চালাতে নিষেধ করা হতো বাহিনীকে। এখন পাথরবাজদের পাথরের উপযুক্ত জবাব প্রয়োজন অনুযায়ী দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। ফলে বাহিনীর মনোবলও এখন অনেক দৃঢ়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনেক শক্ত মনোবল নিয়ে ভারত লড়াই করছে। আগেই বলেছি ২০০৮ সালে ২৬/১১-এর মতো জঙ্গি হামলা ভারতের ওপর ঘটে গেলেও ভারতের তৎকালীন মনমোহন সিংহের সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পালটা আঘাত হানেনি। ২০১৯ সালে পুলওয়ামাতে সিআরপিএফ বাহিনীর ওপর আত্মঘাতী হামলার পর বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক হয়েছিল। ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরন ভ্যালিতে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের ৯টা জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারত ঘোষণা করেছে এরপর যে কোনো জঙ্গি হামলাকে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে দেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটাই হলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কিংবা আলাপ আলোচনা কিংবা তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধান অন্তত জঙ্গিবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেবলমাত্র কঠোর নীতি দিয়েই সন্ত্রাসবাদের শিকড় উপড়ে ফেলা সম্ভব।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভারতের এই পদক্ষেপের তাৎপর্য আলোচনা করা যেতে পারে। বিশ্ব পরিস্থিতির চরিত্র অতি দ্রুত বদলাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির চলমান প্রক্রিয়াটিকেই বদলে দিতে চাইছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন রাজনীতিতে আবির্ভাব হওয়ার আগে পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতিতে যেগুলিকে গুরুত্বের জায়গা বলে মনে করতো ট্রাম্পের কাছে সেগুলো নিতান্তই তুচ্ছ এবং মার্কিন স্বার্থবিরোধী। ট্রাম্পের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যারা সেই স্বার্থের বাধা হয়ে দাঁড়াবে তারা আমেরিকার ঘোরতর শত্রু। এশীয় রাজনীতিতে চীনকে কোণঠাসা করতে ট্রাম্প সমস্ত রকমের চেষ্টা করে চলেছেন। দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সেখানেও জটিলতা দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বরাজনীতিতে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে। এক প্রভাবশালী বিশ্বশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে চাই এক শক্তিশালী দেশের ভাবমূর্তি। ভারত সেই ভাবমূর্তিই তৈরি করেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিবৃতি

পহেলগাঁওয়ে সংঘটিত কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসবাদী হামলার পর পাকিস্তান-পৃষ্ঠপোষিত জঙ্গি ও তাদের সহায়ক পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে শুরু হওয়া কঠোর অভিযান— **অপারেশন সিঁদুর**-এর জন্য ভারত সরকারের নেতৃত্ব এবং আমাদের সামরিক বাহিনীকে অভিনন্দন জানাই। হিন্দু পর্যটকদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে যে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা সারা দেশের আত্মসম্মান ও সাহসিকতাকে আরও মজবুত করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের পরিকাঠামো ও সহায়ক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদের সামরিক বাহিনীর এই দৃঢ় পদক্ষেপ দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। রাষ্ট্রীয় সংকটের এই মুহূর্তে সমগ্র দেশ তন-মন-ধন দিয়ে সরকার এবং সামরিক বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা ভারত সীমান্তে উপাসনাস্থল ও জনবসতির উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি এবং এই আক্রমণের শিকার হওয়া পরিবারগুলির প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করছি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই সংকটময় সময়ে দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাচ্ছে যে, সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সব তথ্য ও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা যেন সবাই যথাযথভাবে অনুসরণ করেন। এছাড়াও নাগরিক কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আমরা যেন এই কঠিন সময়ে সতর্ক থাকি যাতে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলি আমাদের সমাজের ঐক্য ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করতে না পারে।

আমরা সমস্ত দেশবাসীকে আহ্বান করছি, এই সময় নিজ নিজ দেশভক্তির প্রমাণ দিয়ে সামরিক বাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের যে কোনো প্রয়োজনে, যেভাবে সম্ভব, সর্বতোভাবে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং দেশের ঐক্য ও নিরাপত্তা অটুট রাখতে সমস্ত রকম প্রচেষ্টাকে শক্তি জোগান।

দত্তাত্রেয় হোসবলে	**মোহন ভাগবত**
সরকার্যবাহ	সরসঙ্ঘচালক
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ	রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

বিশ্বের যে কোনো শক্তিশালী দেশ আক্রান্ত হলে পালটা আঘাত করে। আমেরিকায় ৯/১১ সন্ত্রাসবাদী হানার ২৫ দিনের মধ্যে ওসামা বিন লাদেন এবং আল কায়েদার আশ্রয়দাতা আফগানিস্তানকে অনেক মূল্য চোকাতে হয়। গত প্রায় ২৫ বছর বিশ্ব ব্যবস্থায় ইসলামি সন্ত্রাসবাদের যে বিপজ্জনক জুটি তৈরি হয়েছে তাকে কঠোরভাবে ধ্বংস করে ফেলা প্রয়োজন। ভারত যেভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রত্যাঘাত করেছে তা অধিকাংশ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেশ যদি অনুসরণ করে, তবে সন্ত্রাসবাদের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা সম্ভব। নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের ভূমিকায় উন্নীত হতে গেলে আগে সন্ত্রাসবাদের মতো বিপজ্জনক শক্তিকে নিজের ঘরের পাশে রাখা যাবে না। কারণ সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সহাবস্থান অসম্ভব। □

একটি মেয়ের কুড়িটি চিঠি

মৃত্যুপুরীর সঞ্জীবনী

একটি মেয়ে ৩৭ বছর বয়স। এখন সে পরিণত। এটা বুঝতে পারার জন্য যে মাত্র ৬ মাস বয়সে যখন সে মাতৃহারা হয়, যখন তার মায়ের ৩১ বছর বয়স। কী মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কষ্ট পাচ্ছিল তাঁর মা। তিনি মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন আর শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বামী সেই দেশের সবথেকে শক্তিশালী মানুষটিকে। সেই মানুষটি এই ৩৭ বছরের মেয়েটির বাবা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাধিনায়ক জোসেফ স্তালিন।

তৃতীয় পর্ব

পিন্টু সান্যাল

শ্বেতলানাকে ঘিরে ছিল এক ঘূর্ণিঝড়— বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ঘূর্ণিঝড়। স্তালিন সাম্যবাদী সমাজ রচনার মরীচিকার পিছনে দৌড়াচ্ছিলেন আর সোভিয়েত সমাজের লক্ষ লক্ষ পরিবারের মতোই তার নিজের মেয়ের জীবনেও নেমে আসে নিঃসঙ্গতা।

অ্যানা সের্গেয়েভনা আলিলুয়েভা ছিলেন নাদেঝদা আলিলুয়েভার বড়ো বোন, শ্বেতলানার মাসি। পরিবারের জ্যেষ্ঠ কন্যা হিসেবে অ্যানা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমতী। তাঁর ভাই-বোনদের মতো তিনিও বলশেভিক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন।

শ্বেতলানার আত্মকথায় তার মাসির করুণ পরিণতির কথা জানা যায়। অ্যানা, স্তানিস্লাভ রেডেন্স-কে বিয়ে করেন, যিনি NKVD (সোভিয়েত গোপন পুলিশ)-এর একজন সিনিয়র কর্মকর্তা এবং স্তালিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। রেডেন্স ছিলেন স্তালিনীয় নিরাপত্তা সংস্থার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, যিনি ইউক্রেন ও পরবর্তীকালে মস্কোতে NKVD-র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এক সময়, অ্যানা ও রেডেন্স সোভিয়েত অভিজাতদের মতো স্বচ্ছল ও সুবিধাপ্রাপ্ত জীবনযাপন করছিলেন। তাদের একটি কন্যা সন্তান ছিল এবং তারা স্তালিনের অন্তরঙ্গ বৃত্তের অংশ ছিলেন। তবে ১৯৩০-এর দশকে রাজনৈতিক পরিবেশ অন্ধকার হয়ে উঠলে, তাদের ভাগ্যে নেমে আসে এক করুণ পরিণতি। ১৯২৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পলিটব্যুরোর ৭ সদস্যের (জোসেফ স্তালিন, নিকোলাই বুখারিন, মিখাইল তমস্কি, গ্রিগরি জিনোভিভ, লিওন ট্রটস্কি, লেভ কেমনেভ আর আলেক্সেই রেকভ) মধ্যে ১৯৪০ সাল আসতে আসতে একমাত্র বেঁচে ছিল স্তালিন। সমাজকে 'শ্রেণী সংগ্রাম'-এ রক্তাক্ত করা কমিউনিস্টরা নিজেদেরই ক্ষমতা দখলের জন্য রক্তাক্ত করছিল সেই সময়।

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে সার্গেই কিরভ লেনিনগ্রাদে এক আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। অনেকে বলেন এই হত্যাকাণ্ডের পিছনেও স্তালিনের হাত ছিল। স্তালিনের কাছে সুযোগ এসে গেল বিরোধী কণ্ঠস্বরকে বিলুপ্ত করার। 'The Great Purge' নামের বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে প্রায় সাত লক্ষ মানুষকে নিকেশ করে স্তালিন। কিন্তু বিশ্বমঞ্চে স্তালিনের পাশবিক রূপ ঢাকতে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট নেতাদের চেষ্টার খামতি ছিল না। মস্কোয় ১৯৩৫ সালের কংগ্রেসে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মরিস থোরেজ ব্যাখ্যা করেন কীভাবে স্তালিন শ্রমিকদের গর্বিত করেছেন।

১৯২৬ সাল থেকেই বিরোধীদের 'জিনোভিভাইটস্' অথবা 'ট্রটস্কাইটস্' তকমা দিয়ে পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ শুরু করে স্তালিন। গোপন পুলিশকে শুধু প্রতিবিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে ব্যবহার করা হয়নি বরং পার্টির অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যকে দমন করতেও ব্যবহার করা হয়েছিল। 'শ্রেণী সংগ্রাম' তত্ত্ব দিয়ে শুধু সমাজকেই ভাগ করা হয়নি, যে কোনো মতপার্থক্যকে দমন করতে পার্টির অভ্যন্তরেই প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত সংগ্রাম চলছিল। গোপন পুলিশ একসময় লেনিনগ্রাদে জিনোভিভের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিরোধীদের নিশ্চহ্ন করেছিল আর এবার দাঁড়াল জিনোভিভের সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার পালা। ১৯২৭ সালেই সমস্ত প্রধান নেতা ট্রটস্কি, জিনোভিভ, কেমনেভ, রাডেক, রাকোভস্কি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত ও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত NKVD-র প্রধান হিসেবে নিকোলাই ইয়েজহভের সময় সাধারণ মানুষ থেকে পলিটব্যুরো পর্যন্ত অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। লেনিনের খ্যাতিমান সঙ্গীদের প্রত্যেকেই সোভিয়েত সরকার বিরোধী কাজকর্ম, অন্তর্ঘাত, সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভাঙার চক্রান্তে জড়িত থাকা, সোভিয়েতের নেতাদের হত্যার চক্রান্তে জড়িত থাকার স্বীকারোক্তি দেয়। মস্কোতে প্রথম সারির নেতাদের বিচারের নাটক, সোভিয়েত রাশিয়ায় ঘটে চলা সামাজিক উৎপীড়ন থেকে নজর ঘোরাতে সহায়ক হয়েছিল।

স্তালিনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকা সত্ত্বেও রেডেন্সকে গুপ্তচরবৃত্তি এবং সোভিয়েত বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত

করা হয়। এই অভিযানের সময়, স্তালিন প্রায়শই তার নিকটতম সহযোগীদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করতেন, যাতে তিনি তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেন এবং সম্ভাব্য বিরোধীদের নির্মূল করতে পারে।

১৯৩৮ সালে স্তানিস্লাভ রেডেন্সকে NKVD গ্রেপ্তার করে। প্রথমে, অ্যানা বিশ্বাস করতে পারেননি যে তার স্বামী একজন দেশদ্রোহী হতে পারেন। অন্যান্য স্ত্রীর মতো তিনিও হয়তো তার মুক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন, কিন্তু এই ধরনের আবেদন প্রায়ই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলত। শ্বেতলানার বিবরণ থেকে তার জীবনের উপর এই গ্রেপ্তারের প্রভাব জানা যায়— 'আমার মাসিমা অ্যানা এবং তাঁর ছেলে-মেয়েরা মস্কোতে চলে এলেন রেডেন্স গ্রেপ্তার হওয়া পর। অন্যদের স্ত্রীরা যেভাবে সবকিছু হারিয়েছিলেন, তার বিপরীতে মাসিমাকে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে আমাদের বাড়িতে আসার অনুমতি আর দেওয়া হয়নি। আমি তখন মাত্র এগারো বছর বয়সি, তাই বুঝতে পারিনি ঠিক কী ঘটেছে। সবাই কোথায় চলে গেল? বাড়িটা এত ফাঁকা কেন? 'স্তানিস্লাভ কাকু খারাপ মানুষ'— এই ধরনের অস্পষ্ট গুজবগুলো আমার কাছে কোনো অর্থ বহন করত না। শুধু এতটাই বুঝতাম যে বাড়িটা ক্রমশ আরও বেশি শুনশান হয়ে উঠছে, আর আমার জীবনে এখন কেবল স্কুল আর আমার স্নেহশীলা আয়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই'।

রেডেন্সকে নির্যাতন করা হয় এবং জোরপূর্বক মিথ্যা স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয়। ১৯৪০ সালে, তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু তখনো অ্যানাকে তার স্বামীর মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়নি এবং অ্যানা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন তার স্বামী জীবিত।

অ্যানার দুর্ভোগের কথা প্রত্যক্ষদর্শী শ্বেতলানার বিবরণ থেকেই জানা যাক— '১৯৪৮ সালে, যখন ১৯৩৭ সাল থেকে দশ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করা বহু মানুষকে আবারও গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়, তখন আমার মাসিমা অ্যানাও রেহাই পাননি। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অ্যাকাডেমিশিয়ান লিনা শটার্ন, লোজোভস্কি ও মোলোটভের স্ত্রী পলিনা ঝেমচুজিনার সঙ্গে— যিনি ছিলেন আমার মায়ের পুরনো ও ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ছয় বছর পর, ১৯৫৪ সালের বসন্তে তিনি ফিরে আসেন। কিছুটা সময় তিনি একাকী সেলে ছিলেন, তবে বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন জেল হাসপাতালেই। বংশগত অভিশাপ— যে স্কিজোফ্রেনিয়া আমার মায়ের পরিবারকে কষ্ট দিত— তাতেও আক্রান্ত হন তিনি। এমনকী ভাগ্যের উপর্যুপরি আঘাতে মাসিমা অ্যানাও নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারেননি। তিনি চরম দুরবস্থায় ছিলেন। তাঁর ফিরে আসার প্রথম দিন আমি তাঁকে দেখি।

তিনি তাঁর পুরনো ঘরে বসে ছিলেন, নিজের বড়ো হয়ে যাওয়া দুই ছেলেকে পর্যন্ত চিনতে পারছিলেন না, অশেপাশে কাউকেই যেন তিনি জানতেন না। তাঁর চোখ ছিল ধোঁয়াটে, তিনি জানালার দিকে অপলক তাকিয়ে ছিলেন— আমরা যখন তাঁকে জানাচ্ছিলাম আমার বাবার মৃত্যু, ঠাকুমার মৃত্যু, আর আমাদের চিরশত্রু বেরিয়ার পতনের খবর— তাঁরা মনে কোনো ছাপ ফেলছিল না। তাঁর একমাত্র প্রতিক্রিয়া ছিল কেবল নিষ্প্রাণভাবে মাথা নাড়ানো।' যিনি একদিন নিউরোসাইকিয়াট্রিস্ট হতে চেয়েছিলেন স্তালিনের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' তাকেই মনোরোগী করে তুলেছিল কোনো অপরাধ ছাড়াই।

রেডেন্সের মৃত্যুর পরপরই অ্যানাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। স্তালিনের শ্যালিকা হওয়া সত্ত্বেও তিনি রক্ষা পাননি। স্তালিনকে এক্ষেত্রে যথার্থ মার্কসবাদী বলা যায়, কারণ মার্কসবাদের দৃষ্টিতে পরিবার, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক। মার্কসবাদ বলে আদিম সাম্যবাদী সমাজে পরিবারের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তাই স্তালিনের কাছে সম্পর্কের কোনো মূল্য না থাকাই স্বাভাবিক।

আলিলুয়েভা পরিবারের সকলেই একে একে আত্মহত্যা, গুলাগের বন্দি, গুলিতে নিহত, গুলাগ-ফেরত মানসিক রোগীতে পরিণত হয়— এই সবের সাক্ষী শ্বেতলানা আর আলিলুয়েভা দম্পতি। শ্বেতলানা তাঁর পিতামহ ও পিতামহীর যন্ত্রণার জীবনকে আর পাঁচটা সাধারণ পরিবারের থেকে পৃথক করে দেখেননি বরং বলেছেন সেই সময়ের সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষের জীবনে এইরকম দুর্ভাগ্য কোনো ব্যতিক্রম নয়— 'Each of their children came to a tragic end. Life broke them all in different ways. Was it the fate of everyone at that time?'

সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষের এই দুর্ভাগ্যের মূল কারণ শ্বেতলানা উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষকে ও পৃথিবীর ইতিহাসকে মার্কসবাদ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে আর সেখানে কোনো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। এত মৃত্যু, অসহায়তার মাঝে দাঁড়িয়েও শ্বেতলানা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়েছিলেন, মার্কসবাদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শ্বেতলানা বুঝেছিলেন একটিমাত্র মতাদর্শ আর তার ভিত্তিতে সমাজকে বদলানোর নামে যারা পৃথিবীকে নৃশংসতা দিয়েছে, সাম্যবাদের নামে মানুষের মানবাধিকার কেড়ে নিয়েছে তারা উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নয়— 'হে প্রভু, কত সুন্দর তোমার এই পৃথিবী, আর কত নিখুঁত— প্রতিটি ঘাসের ডগা, প্রতিটি ফুল, প্রতিটি পাতা! আর তুমি মানুষকে নিরন্তর সহায়তা করে যাচ্ছো, তাকে শক্তি দিচ্ছো এই ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মাঝে, যেখানে কেবল প্রকৃতিই— অপরাজেয় ও চিরন্তন— শান্তি ও শক্তি, সুর ও আত্মার প্রশান্তি দিয়ে যায়।'

শুধুমাত্র তারাই, যাদের ঈশ্বর অভিশপ্ত ও পরিত্যক্ত করেছেন, এই পৃথিবীর সৌন্দর্য মহিমাকে ভাঙতে পারে, অথবা ধ্বংস করার কথা ভাবতে পারে— যা বেড়ে ওঠে, ফুল ফোঁটে, আর জীবনে আনন্দ আনে। কত ভয়ংকর, যে দুনিয়ায় এত পাগল মানুষ আছে। কত ভয়ংকর এবং কত ভুল, যে তারা নিজেদের জন্য লক্ষ্য স্থির করে এবং সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য জীবন ধ্বংস করাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে।

অতি দরিদ্র কৃষক-ঘরনির কাছেও এটা স্পষ্ট যে এমন কিছু ঘটতে দেওয়া যায় না। অথচ যারা নিজেদের সভ্য বলে দাবি করে, তারা তা দেখতে পায় না। চীনা কমিউনিস্টরা যারা নিজেদের মার্কসবাদী বলে মনে করে, তারা বিশ্বাস করে— শুধু সম্ভব নয়, বরং প্রয়োজন— যে মানুষকে একে অপরকে ধ্বংস করতে হবে। এক পাশে আছে অশুভভাব ও উন্মত্ততা; অন্য পাশে আছে বুদ্ধি, অগ্রগতি, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতা। বিশ্ব শান্তি ঝুলে আছে এই নরকতুল্য ভারসাম্যে। আমরাও— আমাদের প্রজন্ম, আমাদের সন্তান, এই যুগ— সেই সঙ্গেই ঝুলে আছি।

আমাদের সকলেরই উচিত শালীনতা ও শুভ ইচ্ছাশক্তির শক্তিতে বিশ্বাস রাখা। সোভিয়েত রাশিয়ার মৃত্যুপুরীতে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরে শ্বেতলানার বিশ্বাসই সঞ্জীবনী— 'যখন আমি পঁয়ত্রিশে পৌঁছলাম এবং জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা হলো, আমি— যাকে শৈশব থেকেই পরিবার ও সমাজ নাস্তিক ও বস্তুবাদী করে তুলেছিল— তখন আমি হয়ে উঠেছি সেইসব মানুষের একজন, যারা ঈশ্বর ছাড়া বাঁচতে পারে না। আমি আনন্দিত যে তা-ই হয়েছে।'

শ্বেতলানা যেন রাক্ষসরাজের সন্তান প্রহ্লাদের মতোই নিজের বিশ্বাসে অটল। সোভিয়েত রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ ঘরে লক্ষ লক্ষ 'শ্বেতলানা'র আত্মকথা অজানা থেকে গেলেও সাত দশক ধরে সোভিয়েত রাশিয়ার লৌহ যবনিকাকে ভেদ করতে শ্বেতলানাই যথেষ্ট। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙন শ্বেতলানার কথাগুলোকেই সত্য বলে প্রমাণিত করে। কিন্তু 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'কে সামনে রেখে সমাজ পরিবর্তনের ভাবনায় উন্মত্ত অশুভ শক্তি এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রিয়াশীল। বিভিন্ন দেশের সমাজ, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি মানবাধিকার বাঁচাতে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে শ্বেতলানার এই ২০টি চিঠিই সঞ্জীবনী। *(সমাপ্ত)*

যুদ্ধের মুহূর্তে কেন আইএমএফ পাকিস্তানকে বাঁচাতে এল ?

ভারত-পাকিস্তান অস্ত্র যুদ্ধের অনেক আগে পাক সন্ত্রাসবাদ দমনের লক্ষ্যে ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভারত। পৃথিবীতে অপরিশোধিত তেল সরবরাহের উৎস হলো আমেরিকা, রাশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কিছু দেশ ও বিভিন্ন আরব দেশ। বাকি ছিল ইরান। ইরান থেকে ব্ল্যাক মার্কেটে তেল নিয়ে যেত পাকিস্তান। বালোচিস্তানের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে তেলের এই স্মাগলিং র‍্যাকেটের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে পাকিস্তানি সেনার হাতে। ব্ল্যাক মার্কেটের মাধ্যমে পাকিস্তানে তেল যেত অর্ধেক দামে, যেখানে 'সুইফট্ কোড'-এর প্রয়োজন হতো না। ইরানে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে পুরো লেন-দেনই হতো হাওলার মাধ্যমে। এই লেন-দেন বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অঙ্কের। আর এই তেল আসার রাস্তা বালোচিস্তান। এখন বালোচিস্তান যদি স্বাধীনতা হয়ে যায়, তবে পাকপঞ্জাব এই তেল পাবে না। সঙ্গে চীনের সঙ্গে ইরানের যোগাযোগের রাস্তাও বন্ধ হবে। হাওয়ালা সিস্টেম মেনে নিতে কিছুটা বাধ্য হয়েছে ইরান এই মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জন্য।

গত ৭ মে ইরানের বিদেশমন্ত্রী ভারত সফরে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর কয়েকটি স্ট্র্যাটেজিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তার মধ্যে মূল চুক্তি হলো, পাকিস্তান কালোবাজারের মাধ্যমে ইরান থেকে যে পরিমাণ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে, ভারত ইরানের কাছে ওই সমপরিমাণ তেল বাজারদরে কিনতে রাজি হয়। তবে একটা শর্তে যে পাকিস্তানকে হাওলার মাধ্যমে তেল বিক্রি বন্ধ করতে হবে পুরোপুরি। এর পরিবর্তে ভারত 'বার্টার সিস্টেম' বা বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের ওষুধ, খাদ্য, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি ইরানে পাঠাবে চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে। এখনও চাবাহার বন্দরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রাখেনি, যেহেতু ভারত এখানে বিনিয়োগকারী। এক্ষেত্রেও 'সুইফট্' সিস্টেমের ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। মার্কিন বাধাও থাকবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য হবে সম্পূর্ণ আইনানুগ পথেই। বালোচ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বর্তমানে বালোচিস্তানে পাকিস্তানি সেনাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। ফলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তেল পাবে না পাকিস্তান। এই মুহূর্তে আইএমএফ (ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড) থেকে এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফেসিলিটি (ইএফএফ) খাতে ১ বিলিয়ন ডলার এবং রেজিলিয়েন্ট অ্যান্ড সাসটেনেবিলিটি ফেসিলিটি (আরএসএফ) খাতে ১.৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ পাচ্ছে পাকিস্তান। এই ব্যাপারে আইএমএফ-এর অন্যতম সদস্য ভারতের ইচ্ছা না থাকলেও অনুমোদন দেয় আইএমএফ। প্রথমটা দেওয়া হয় আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্যহীনতার হাত থেকে কোনো দেশকে বাঁচাতে। দ্বিতীয়টি দেওয়া হয়, জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ে। পাকিস্তানের এই ঋণপ্রাপ্তির বিষয়টিকে অনেকেই ভারতের কূটনৈতিক ব্যর্থতা বললেও, দুটি ঋণই আগেই অনুমোদন করা ছিল এবং সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর যে, ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে খাতায়-কলমে পাকিস্তান নাকি সব শর্ত মেনেছে। কিন্তু এটা ঠিক যে, আর্মি এস্টাব্লিশমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন পাকিস্তান সরকার এই অর্থ সন্ত্রাসবাদের কাজেই লাগাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৭ মে মধ্যরাতে ভারত লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ ও হিজবুল মুজাহিদিনের যেসব মসজিদ, মাদ্রাসা ও জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে দিয়েছে, এর মধ্যেই সেইসবের জন্য তারা ক্ষতিপূরণ চাওয়া শুরু করেছে পাকসেনার কাছে।

এই প্রতিবেদন যখন লেখা চলছে তখন শোনা যাচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত-পাকিস্তান দুই দেশকেই সংঘর্ষবিরতির জন্য অনুরোধ করেছে। গত ১০ মে প্রাথমিকভাবে সেটা মেনে নিলেও, তার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। ফলে পাকিস্তানের তরফে কোনো আক্রমণ হলে ভারতের পক্ষে তার জবাব দেওয়া অব্যাহত থাকবে। আগামীদিনে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি হবে নতুন পরিস্থিতি। ঘটনায় আসবে আরও নতুন মোড়। এই পটভূমিতে হয়তো কিছু নতুন স্টেকহোল্ডার (বিভিন্ন পক্ষ)-এর আবির্ভাব ঘটবে এবং তার সঙ্গে নতুন মোড় নেবে অর্থনীতি ও ভূরাজনীতি। এই যুদ্ধের ফল পালটে দেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেকার সম্পর্কের রসায়ন। এর প্রভাব হয়তো পড়বে ভারতেও। বাদ পড়বে না চীন, আরব দুনিয়া, বাংলাদেশ-সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইউরোপও। দেখা যাক কোন দিকে মোড় নেয় আজকের ধর্মযুদ্ধ।

ধর্ম হিংসা তথৈব চ : রাষ্ট্ররক্ষার মন্ত্র

বিপ্লব বিকাশ

পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় দেশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২৬ জন নিরীহ হিন্দুকে ধর্ম জিজ্ঞেস করে হত্যা করা হয়েছে। শুধু এই কারণে যে, তাঁরা 'কলমা' জানতেন না বা পড়তে পারেননি। এই বর্বরতা নতুন কিছু নয়—তবুও প্রতিবারের মতোই দেশকে নাড়া দিয়ে যায়। এই ঘটনার পর দেশবাসী একজোট হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায়, রাস্তায়,ঘরে ঘরে আলোচনায় উঠে এসেছে একটাই কথা, এবার সরকারকে শক্ত হতে হবে। কিন্তু সব জায়গা থেকে এই ধ্বনি ওঠেনি। কিছু তথাকথিত 'প্রগতিশীলরা' তখনো সরকারের বিরোধিতা করার রাস্তাতেই হাঁটলেন। প্রশ্ন তুললেন, 'কেন্দ্র কী করছিল?' সামাজিক মাধ্যমে কেউ কেউ লিখলেন, 'উগ্রপন্থার কোনো ধর্ম হয় না।' এটা এই ঘটনার পিছনে লুকিয়ে থাকা জেহাদিদের বাস্তব চিত্রকে আড়াল করার চক্রান্ত।

এক পোস্টে কেউ লিখলেন, 'যদি সুজনদা আর মহম্মদ সেলিম একসঙ্গে পহেলগাঁও থাকতেন, সেলিম বেঁচে যেতেন কলমা পড়তে পারার কারণে, কিন্তু সুজন?' এই বক্তব্য নিছক ব্যঙ্গ নয়, এটা এক গভীর সত্যকে তুলে ধরে। আজকের ভারতে ধর্মীয় পরিচয় জীবনের মূল নির্ধারক হয়ে দাঁড়ালে, সেটি কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। এই আক্রমণের পরে ভারত সরকার যখন কড়া পদক্ষেপ নেয়, তখন নতুন এক বিতর্ক শুরু হয়। গত ৭ মে মধ্য রাতে ভারতীয় সেনা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে, সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে ধ্বংসাত্মক অভিযান চালায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান ঘনিষ্ঠ ও চীনানির্ভর বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি মুখ খোলে—'ডি-এস্ক্যালেশন চাই'। কলকাতার রাজপথে বামপন্থীরা যুদ্ধবিরোধী স্লোগান দেয়। যে বামপন্থীরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একসময় 'বুর্জোয়া কবি' বলে অপমান করেছিল, মহম্মদ সেলিম এবার তাঁর জন্মজয়ন্তীতে গিয়ে 'ডি-এস্ক্যালেশন' চাইলেন। দ্বিচারিতার এমন উদাহরণ বোধহয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

ইতিহাস সাক্ষী যে, যুদ্ধ বা দেশরক্ষা কখনোই এককেন্দ্রিক ঘটনা নয়। কোনো দেশে কোনো শত্রু যদি নিজের নাগরিকদের হত্যা করে, তাহলে সরকারকে জবাব দিতেই হবে। কিন্তু তাহলে কেন সেনাবাহিনী জঙ্গিদের ধ্বংস করছে বলে রব ওঠে? তখন কেন একটি গোষ্ঠী তৎপর হয়ে শান্তির বুলি আওড়াতে থাকে? চিনে রাখতে হবে, এরা পাকিস্তান- চীনের এজেন্ট।

সন্দেহের কিছু নেই যে চীনের বিশাল বিনিয়োগ রয়েছে পাকিস্তানে। পাকিস্তান অস্থির হলে চীনের লগ্নি বিপন্ন হবে, এই আতঙ্কে বামপন্থী দলগুলি মাঠে নামে। কারণ, চীনের লগ্নিকারীরা ও লাল চিন্তাধারার আন্তর্জাতিক যোগ আজও অটুট। এদের কাছে ভারতীয় সেনার সাহসিকতা, দেশের, আত্মরক্ষা, নাগরিকদের সুরক্ষা, সবই গৌণ।

এদের আসল লক্ষ্য হলো, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোটের বড়ো অংশকে খুশি রাখা, যাতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আবার ঘুরে দাঁড়ানো যায়। পাশাপাশি, বিদেশি এনজিও এবং মদতদাতা গোষ্ঠীকে দেখানো, 'আমরা মাঠে আছি, কাজ করছি।' ফলে চুপ করে বসে থাকা যায় না, তাই যুদ্ধবিরোধী স্লোগান, শান্তির নাটক এবং মানবাধিকারের মুখোশ পরে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার প্রচেষ্টা জারি থাকে।

ভারত সরকারকে তখন দোষারোপ করা হয় যে তারা 'উগ্র রাষ্ট্রবাদকে' হাতিয়ার করেছে। অথচ সেনাবাহিনী যখন মৃত্যুবরণ বা প্রত্যাঘাত করে, তখন তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করে থাকে। যে কর্তব্যে নিজের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে, দায়িত্ব রয়েছে কোটি কোটি নাগরিককে রক্ষার। ভারত সরকারের দায়িত্ব হলো দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুদের মোকাবিলা করা, নাগরিকদের রক্ষা করা। সেই কর্তব্য পালনের পথেই যদি সন্ত্রাসের শিকড় কেটে ফেলা হয়, তা হলে তা উগ্রতা নয়, বরং ন্যায়।

ভারতীয় দর্শনে ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধও ধর্মের অঙ্গ বলে স্বীকৃত। স্পষ্ট বলা হয়েছে, যদি দেশ, জাতি ও ধর্ম বিপদের সম্মুখীন হয়, তাহলে হিংসাও ধর্মের রূপ নেয়। ভারতীয় সংস্কৃতি সবসময়ই এই উপলব্ধিকে ধারণ করে রেখেছে। দুর্গাপূজা কেন করা হয়? শ্রীরাম অকালবোধন কেন করলেন? আজকের পরিস্থিতিতে এই উপলব্ধিই আমাদের সবচেয়ে বড়ো মন্ত্র হওয়া উচিত। একদিকে দেশ যখন সুরক্ষার লড়াই করছে, অন্যদিকে কিছু মানুষ 'ডি-এস্ক্যালেশন' আর 'মানবতা'-র নাম করে দেশের শত্রুকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এতে অন্য কারও লাভ হতে পারে, ভারতের নয়।

বামপন্থীদের মিথ্যা বিমর্শকে চিনতে হবে। ওরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইবে, যাতে তারা দেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে, সেনার উপর আঙুল তোলে। কিন্তু ভুললে চলবে না, যারা পহেলগাঁওয়ে ২৬ জনকে ধর্ম জিজ্ঞেস করে হত্যা করল, তারা মানবতাবাদী হতে পারে না। এবং যারা সেই হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে চায় না, তারাও ভারতের বন্ধু নয়।

ভারতকে রক্ষা করতে হলে, এই লাল ছায়ার নীচে গজিয়ে ওঠা ভুয়ো মানবতাবাদকে রুখতেই হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, দেশের জন্য, সত্যের জন্য, এই রাজনৈতিক নাটকের মুখোশ খুলে দিতে হবে। চীন ও পাকিস্তানের জন্য যে নাটক চলছে, তা বন্ধ হোক।

ভারত রক্ষা হোক, সত্য রক্ষা হোক, ভবিষ্যৎ রক্ষা হোক।

(১৭)

গল্পকথায় ডাক্তারজী

বিপ্লবী কাজের সান্নিধ্যে

১৯০৮ সালে আগস্ট মাসে ক্ষুদিরামের ফাঁসির পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, ইংরেজের নৃশংস দমন নীতি ও শত শত বিপ্লবীকে কারাবন্দি করার কারণে সে আন্দোলনের স্রোত পরবর্তীতে অনেকটা স্তিমিত হয়ে এল। যে যে সংগঠন এই আন্দোলনের ধারাকে সজীব রাখার সার্বিক প্রয়াস করে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে পুলিনবিহারী দাসের 'অনুশীলন সমিতি'র ভূমিকা ছিল অন্যতম। আন্দোলন বিষয়ক পুস্তিকা, প্রচারপত্র গুপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন প্রদেশেও এসব সামগ্রী গোপনে প্রেরণ করা হতো। এর জন্য প্রয়োজন হতো আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ও কৌশলী যুবকদের, যারা সরকারের বক্র দৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও এরকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেবে। কেশব সর্বাগ্রে নিজেকে এগিয়ে দিলেন এই বিপ্লবী কাজের জন্য। ছুটির সময় নাগপুরেও এ ধরনের সামগ্রী নিয়ে তিনি যথাস্থানে পৌঁছে দিতেন।

বিপ্লবী রামলাল বাজপেয়ী তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কেশবরাও ছুটিতে নাগপুরে গেলে তাকে বলা হয় যাবার সময় তিনি যেন দু' তিনশো টাকা মূল্যের রিভলবার নিজের সঙ্গে বিপ্লবীদের জন্য নিয়ে যান। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তার 'জেলের ত্রিশ বছর' গ্রন্থে লিখেছেন, কেশবরাওয়ের কলেজের এক সহপাঠী নলিনী কিশোর গুহ তাঁকে ও ডাঃ নারায়ণরাও সাভারকরকে অনুশীলন সমিতিতে নিয়ে এসেছিলেন। এই পুস্তকেই অনুশীলন সমিতির সদস্যদের একটি ছবিতে কেশবরাওয়ের ছবিও অন্তর্ভুক্ত আছে। নাগপুর থেকে আসার পর থেকেই গোয়েন্দা তাঁর পেছনে ঘোরাফেরা করতো। 'শান্তিনিকেতন লজ'-এ থাকাকালীন তাঁর বন্ধু পরাশরকে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে অনুশীলন সমিতির কাজে যেতেন। কখনো কখনো ফিরতে রাত বারোটা-একটা হয়ে যেত। অনেকদিন দেখা যেত গুপ্তচর বেচারা সিঁড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এ নিয়ে অনেক মজার ঘটনাও ঘটেছে। বিপ্লবী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর প্রতি কেশবরাওয়ের ছিল অসীম শ্রদ্ধা। এই ত্যাগব্রতী বিপ্লবীর যেমন ছিল দুঃখবরণের অসীম ক্ষমতা, তেমনি লেখনী ছিল মহাশক্তিধর। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তাঁর লেখা 'Crime of Nationalism' (রাষ্ট্রভক্তির অপরাধ) প্রবন্ধ পড়ে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্রহ্মদেশে কারাবাস থেকে দারিদ্র্যকে হাসতে হাসতে বরণ করে বিপ্লবী কর্মযোগী রূপে তিনি জীবনযাপন করতেন। গাত্রাবরণের জন্য মাত্র একখানি চাদর এবং নগ্নপদে চলাফেরা ছিল তার নিত্য চিত্র। মাঝে মাঝে তিনি কেশবরাওয়ের নিবাসে আসতেন। তিনি এলে সকলে তাকে না খাইয়ে ছাড়তেন না। পারলে হাতে কিছু অর্থ গুঁজে দিতেন। কিন্তু তিনি আবার কারও প্রয়োজনে সঙ্গে যা থাকতো তা বিলিয়ে দিতেন। এই সাত্ত্বিক দেশপ্রেমিকের প্রতি কেশবরাওয়ের এক অন্য মাত্রার শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও ছিল পরমাত্মীয়ের মতো। তাইতো কেশব শ্যামসুন্দরবাবুর কন্যার বিবাহে পাকাদেখা থেকে শুরু করে শুভবিবাহ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজে তদারকি করেছেন। নিজে উপস্থিত থেকে এমন পবিত্র মাঙ্গলিক প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে অর্থও সংগ্রহ করেছিলেন।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস